সহভূমিকা

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী · কলিকাতা - ৬

কাঠের ছোট ফটকের সামনে নীলেন্দু দাঁড়িয়ে থাকল।

পৌষের রোদ এখনও কাঁচা, সারা রাতের হিম জমে আছে ঘাসের ওপর পুরু হয়ে, মাঠঘাট শিশিরে ভেজা ; শীতের খর বাতাসে এই রোদ যেন গায়ে লাগছিল না।

ট্রেন থেকে যখন নেমেছিল নীলেন্দু তখন সবে রোদ উঠছে। স্টেশন থেকে আসতে খানিকটা সময় গিয়েছে তার। মাইল খানেক পথ। সামান্য কমবেশীও হতে পারে। স্টেশনের বাইরে এসে খাপরার ছাউনি দেওয়া দেহাতী চায়ের দোকানে চা খাবার সময় মহীতোষের বাড়ির খবরটা জেনে নিয়েছিল নীলেন্দু। মহীতোষ— এই নামটার এখানে কোনো বিশেষ পরিচয় নেই। মহীতোষের শারীরিক বর্ণনাও যথেষ্ট হত না যদি না নীলেন্দু দেবযানীর কথা তুলত, আরও কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক বিবরণ দিত। বাড়ির খবরটা মোটামুটি জেনে নিয়ে নীলেন্দু চলল রেল ফটকের দিকে। গায়ে লাল রঙের মোটা পুলওভার, গলায় মাফলার, কাঁধে কিট ব্যাগ। পায়ে পুরু ক্যানভ্যাস স্যু! তবু শীত করছিল।

রেল ফটকের লোকটা ডান হাতি মাঠ ভেঙে সরাসরি চলে যেতে বলল ; কাছাকাছি হবে। মাঠ ভেঙেই এসেছে নীলেন্দু। রাস্তা আর মাঠের মধ্যে এমন কোনো তফাৎ অবশ্য চোখে পড়ার কথা নয়। দুইই প্রায় সমান এদিকটায়। মাঠ দিয়ে আসতে আসতে নীলেন্দু জায়গাটার জল মাটি বাতাসের মোটামুটি ধারণা করতে পারছিল। মাটি শক্ত, রঙটাও ঠিক লাল নয়, খয়েরী, নুড়িপাথর আর কাঁকর বুন মাটির সঙ্গে মেশানো। নেড়া রুক্ষ মাঠের কোথাও কোথাও শীতের মরা ঘাস, কোথাও বা ছোট ছোট বুনো ঝোপ।

জায়গাটা ভাল। জল বাতাস যে স্বাস্থ্যকর বোঝাই যায়।

নীলেন্দু স্বীকার করল, মহীতোষদা জায়গাটা পছন্দ করেছে ভালই। চোখ এড়িয়ে থাকার পক্ষে খুবই উপযুক্ত। কলকাতা থেকে অন্তত পৌনে দু শো মাইল।

মাঠ পেরিয়ে বাঁ দিকে তাকাতেই সেই বিশাল শিরীষ। তার সামান্য তফাতে মহীতোষদের বাড়ি।

বাড়ির সামনে এসে নীলেন্দু দাঁড়িয়ে ছিল। কাঁটালতার বেড়া চারপাশে। কাঠের ছোট ফটক। বাড়িটা বাংলো ধরনের, প্রায় চৌকোণো, ছোটখাট, মাথায় খাপরার চাল, চারদিকে ঢালু করে নামানো, উঁচু বারান্দা, খড়খড়ি করা দরজা। আশেপাশে খানিকটা জায়গা পড়ে, সামনের দিকে কিছু গাঁদাফুল ফুটে আছে, আরও কিছু মুরসুমী গাছ। /

নীলেন্দু কাঠের ছোট ফটক খুলে ভেতরে ঢুকল।

কুয়াতলায় কেউ জল তুলছিল। মৃদু শব্দ আসছে। বাড়ির আর কোথাও কোনো শব্দ নেই। মনে হয় বাড়ির লোকজন এখনও ঘুম থেকে ওঠে নি। কিংবা বাইরের দিকে কেউ নেই। অথচ ঘরের দরজা খোলা।

নীলেন্দু বারান্দার সামনে সিঁড়ির কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। ডান দিকে কুয়াতলা। বাঁধানো কুয়া। কুয়াতলার গায়ে কয়েকটা পেঁপে গাছ। দেহাতী মাঝবয়েসী একটি মেয়ে কুয়াতলার একপাশে বসে বাসনপত্র মাজছিল। জোয়ান মতন একজন জল তুলে বালতি ভরছে।

নীলেন্দু ভাবছিল লোকটাকে ডাকবে কি ডাকবে না। তার আগেই ঘরের দিকে সাড়া পাওয়া গেল। নীলেন্দু মুখ ফিরিয়ে বারান্দার দিকে তাকাল।

ততক্ষণে মধ্যের ঘর থেকে কে যেন বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিল। নীলেন্দু ডাকার মতন শব্দ করল। পরনে পাজামা, গায়ে কি আছে বোঝা যাচ্ছে না, গলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত মোটা চাদর জড়ানো, চাদর না কম্বল বোঝা মুশকিল।

খানিকটা বিস্ময়, খানিকটা বা কৌতূহল নিয়ে ছেলেটি বারান্দার ধারে এসে দাঁড়াল। নীলেন্দু বলল, "মহীতোষদা আছেন?" বলে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে থাকল। নীলেন্দুর চেয়ে বয়েস কমই হবে। চোখে মুখে এখনও ঘুম জড়ানো। মাথার চুল উসকো-খুসকো।

"আছেন।...আপনি?" ছেলেটিও নীলেন্দুকে দেখছিল।

"আমি কলকাতা থেকে আসছি।"

ছেলেটি কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই দেবযানী বাইরে এসেছিল ছেলেটিকে কোনো কথা বলতে। বাইরে এসেই নীলেন্দুকে দেখতে পেল। দেখে যেন বিশ্বাস করতে পারল না। থমকে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

নীলেন্দু সিঁড়িতে পা রেখে এমন মুখ করে হাসল যেন দেবযানীকে চমকে দিয়ে মজা দেখছে।

দেবযানী যতটা চমকে উঠেছিল ততটা যেন শঙ্কিত। চমক সামলে মুখের ভাব সামান্য স্বাভাবিক করল। চোখের কোণে তখনও কেমন যেন এক দুশ্চিন্তা।

এগিয়ে এসে দেবযানী বলল, "তুমি!"

নীলেন্দু বলল, "খুব অবাক হয়ে গিয়েছ!"

দেবযানী বলল, "তা হয়েছি।" বলে ছেলেটির দিকে তাকাল। "তোর জিনিসপত্তর পরে গুছিয়ে নিস। দশটায় গাড়ি। এখনও অনেক সময় আছে।"

ছেলেটি চলে গেল।

নীলেন্দু বলল, "কে?"

"ভাই।"

"কার? তোমার না মহীদার?"

"আমার।"

"কই, আগে কখনো দেখি নি তো!" নীলেন্দু হাসল, "তোমার এরকম ভাই এখানে আর কজন আছে।" বলতে বলতে কাঁধ থেকে

কিট্ ব্যাগের স্ট্র্যাপটা খুলে ফেলল নীলেন্দু।

দেবযানী কথার কোনো জবাব দিল না।

মাটিতে ব্যাগ রেখে নীলেন্দু গলার মাফলার আলগা করে নিল। হেসে বলল, "রাগ করলে?"

দেবযানী চোখে চোখে তাকাল না নীলেন্দুর, বলল, "যা ভাব।"

"ওর নাম কি?"

"আশিস।"

"এখানেই থাকে?"

"না; মাঝে মাঝে আসে। এলে দু একদিন থেকে যায়।"

নীলেন্দু বারান্দার কোথাও কোনো বসার ব্যবস্থা দেখতে পাচ্ছিল না। একেবারে ফাঁকা। পকেটে হাত দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই বার করতে করতে বলল, "তোমার কথা শুনে মনে হল, তোমার আশিস আজ চলে যাচ্ছে।"

দেবযানী আড়চোখে নীলেন্দুকে দেখল। বলল, "তোমারও কথা শুনে মনে হচ্ছে, ছেলেটাকে দেখে তোমার স্বস্তি হচ্ছে না। গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছ।"

নীলেন্দু এবার সামান্য জোরে হাসল। বলল, "কিছু মনে করো না, আমি একটু জেলাস; তোমার ভাইয়ের সংখ্যা বাড়লে আমার বুক কাঁপে," বলে নীলেন্দু বাঁ হাতে তার বুক দেখাল। তারপর সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে একমুখ ধোঁয়া গিলে বলল, "যাক্ গে, এসে পর্যন্ত তোমার সঙ্গে ঝগড়া করছি।...মহীদা কোথায়?"

"কাছাকাছি কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"প্রাতঃভ্রমণ!...তা তোমরা কেমন আছ?"

"ভালই।"

নীলেন্দু সামনের দিকে তাকাল। রোদ ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে। সামান্য ঝকঝক করছিল। মহীদা আশেপাশে কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে, হয়ত এখুনি এসে পড়বে। কেমন যেন প্রত্যাশার চোখ নিয়ে নীলেন্দু

কটকটার দিকে তাকিয়ে থাকল।

দেবযানী বলল, "তোমরা কেমন আছ?"

নীলেন্দু সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে বলল, "তুমি যে আজকাল অতিথিকে এই ভাবে অভ্যর্থনা করো জানতাম না, দেবীদি! দু পায়ে একটানা দাঁড় করিয়ে রেখেছ!"

দেবযানী সামান্য অপ্রতিভ হল, বলল, "না না, আমি ঠিক খেয়াল করিনি। এমন আচমকা এলে যে অবাক হয়ে গিয়েছি। এসো, ভেতরে এসো।" বলে দেবযানী নীলেন্দুর ব্যাগ নিজেই উঠিয়ে নিতে যাচ্ছিল। নীলেন্দু বাধা দিল, দিয়ে ব্যাগটা উঠিয়ে নিল।

ভেতরে এসে দেবযানী নীলেন্দুকে যে ঘরে বসতে বলল, সেই ঘরে আশিসের বিছানা, দু চারটে জামা কাপড় ছড়ানো। আশিস হাতমুখ ধুয়ে আসতে কুয়াতলায় গিয়েছে।

শীতের রোদ এখনও এ-ঘরে ঢোকে নি, জানলার বাইরে পড়ে আছে। বড় বড় দুটো জানলা। খড়খড়ি দেওয়া। সবুজ রঙ। জানালার কাঠ মাঝে মাঝে ফেটে যাচ্ছে। দরজা একটাই। বেশ উঁচু। ঘরের মাথায় চটের সিলিং, চুনকাম করা। ঘরের একপাশে একটা বিছানা, তক্তপোশের পায়াগুলো দেখা যাচ্ছিল। কাঠের সাধারণ চেয়ার একপাশে। দেওয়াল-আলনায় আশিসের জামা ঝুলছে।

নীলেন্দু ঘরের চারপাশ দেখতে দেখতে বলল, "কটা ঘর?"

"তিনটে।"

"এটা বোধ হয় তোমাদের অতিথিশালা?"

দেবযানী বিছানাটা পরিষ্কার করতে লাগল। চাদরটা উঠিয়ে নিল, কাচতে দেবে। বাড়তি চাদর আছে দেবযানীর ঘরে। কম্বলটা পাট না করে আপাতত বিছানার ওপর ছড়িয়ে দিল। আশিসের খুচরো জিনিসগুলো একপাশে জড় করে রাখল।

"তুমি একটু বসো; চায়ের জল বসিয়ে আসি।"

নীলেন্দু গলার মাফলার খুলে রেখে বিছানার ওপর বসল।

দেবযানী চলে গেল।

সামান্য বসে থেকে নীলেন্দু বিছানার ওপর আড় হয়ে শুয়ে পড়ল। পায়ে জুতো মোজা, পা দুটো ঝুলিয়ে রাখল। কাল গাড়িতে ঘুম প্রায় হয় নি। ভিড় খুব। শীতও মন্দ ছিল না। মনের মধ্যে উদ্বেগও ছিল। উদ্বেগ আর চিন্তা। মহীতোষদাকে সত্যিই পাওয়া যাবে কিনা সে ব্যাপারেও সন্দেহ ছিল। খবরটা তার কাছে কেমন উড়ো উড়ো লেগেছিল। গিরিজা কার কাছে কোথা থেকে মহীতোষদের খবর পেয়েছে স্পষ্ট করে বলতে পারে নি। একবার শুভঙ্করদার কথা বলল, একবার বলল মহীতোষদার ভাইয়ের মুখে শুনেছে। আবার বলল, মহীতোষদার একটা চিঠি সে দেখেছে বাসুদেবের কাছে। এলোমেলো উলটোপালটা খবর শুনে কাউকে খুঁজতে আসা নিশ্চয় বোকামি। নীলেন্দু অনেক ভেবেচিন্তে সেই বোকামিটুকু করার ঝুঁকি নিল। অবশ্য তার মন বলছিল ঃ এই রকম হতে পারে। মহীতোষদাকে পাওয়া যেতে পারে। দেবযানীদিকেও।

বিছানার ওপর গা ভেঙে শুয়ে থাকতে থাকতে নীলেন্দু এপাশ ওপাশ করল, হাই তুলল।

এমন সময় আশিস ঘরে এল। এসে বিছানায় নীলেন্দুকে শুয়ে থাকতে দেখে কেমন সঙ্কুচিত হয়ে উঠল।

বিছানায় উঠে বসল নীলেন্দু। বসে আশিসের দিকে হাসি-হাসি মুখ করে তাকাল। বলল, "আমার নাম নীলেন্দু। কলকাতা থেকে এসেছি। মহীদাদের অনেকদিনের চেনাজানা, বন্ধুর মতন। আপনি দেবীদির ভাই শুনলাম।"

আশিস প্রথমটায় যেন কি বলবে বুঝতে পারল না ; পরে বলল, "ওঁকে আমি দিদি বলি।"

"কোনো রকম আত্মীয় ?"

"না।"

"দেবীদিকে আমি অন্তত আট-দশ বছর ধরে চিনি। বাড়ির সকলকেই। আপনাকে কখনও দেখি নি তাই বললাম।...আপনি কি আজই ফিরে যাচ্ছেন?"

আশিস মাথা নাড়ল। হ্যাঁ।

"কোথায় থাকেন ভাই আপনি?"

"ঝাড়গ্রাম।"

"ঝাড়গ্রাম! তা হলে তো কাছেই।"

আশিস মাথা নাড়ল।

নীলেন্দু আরও ভালভাবে লক্ষ করছিল আশিসকে। কলকাতার চেহারা যে নয় বুঝতে তেমন কষ্ট হয় না। মফস্বল শহরের ছাপ রয়েছে চোখে মুখে, খানিকটা কুণ্ঠিত আড়ষ্ট, সামান্য যেন গ্রাম্যতা রয়েছে চেহারায়। আশিসকে কেমন লাজুক, সরল, শান্তটান্তই দেখায়। নীলেন্দুর মনে হল, ছেলেটির বয়েস তার চেয়েও অনেকটা কম, অন্তত পাঁচ-সাত বছরের। চালাক চতুর বা বিশেষ বুদ্ধিমান বলেও মনে হয় না। মহীদা আর দেবীদি এই ছেলেটাকে ভিড়িয়ে ফেলেছে নাকি?

আরও কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল নীলেন্দু দেবযানী ঘরে এসে পড়ল। বলল, "চলো, চা খাবে চলো। তোমার মহীদাও আসছে।"

নীলেন্দু উঠে দাঁড়াল।

দেবযানী আশিসকে বলল, "তুই দুটো ভাত খেয়ে যাবি না?"

"না," আশিস মাথা নাড়ল।

"খেয়ে গেলে পারতিস। কোর্ট হয়ে বাড়ি ফিরতে বিকেল হয়ে যাবে।"

"বিকেল হবে না," আশিস বলল, "আগে আগে চলে যাব।"

"যাবার আগে জলখাবার খেয়ে যাবি। চা খাবি আয়।"

"যাচ্ছি।"

দেবযানী চোখের ইশারায় নীলেন্দুকে ডেকে নিয়ে চলে গেল।

বাড়ির পেছন দিকে ঢাকা বারান্দায় এনে দেবযানী নীলেন্দুকে বসতে বলল।

বারান্দার পুব দিক ঘেঁষে রোদ পড়েছে। সাধারণ একটা টেবিল একপাশে, দু তিনটে মামুলি চেয়ার। বারান্দার অন্যদিকে বুঝি রান্নাঘর। ছোট। গায়ে গায়ে আরও একটা চিলতে মতন ঘর, ভাঁড়ার হতে পারে।

নীলেন্দু রোদে দাঁড়িয়ে থাকল। আরাম লাগছে। এখানে দাঁড়িয়ে কুয়াতলা দেখা যায়, কাছেই, পঁচিশ ত্রিশ গজ দূর হবে হয়ত। পেছনের দিকটায় ভাঙা পাঁচিল। কুয়াতলার ওপাশে নিমগাছ, বেশ শীর্ণ।

দেবযানী চা এনে টেবিলের ওপর রাখল।

"মহীদা কই?"

"আসছে। এখুনি এসে পড়বে। তুমি চা খাও।"

"তুমি খাবে না?"

"খাব।"

নীলেন্দু চেয়ারে বসল। "তোমাদের এখানে প্রচণ্ড শীত।"

"আরও পড়বে শুনেছি।"

"কষ্ট হয় না তোমাদের? কলকাতার লোক।"

আস্তে মাথা নাড়ল দেবযানী। "না, সহ্য হয়ে যাচ্ছে।" বলে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল আবার।

নীলেন্দু চা খেতে খেতে আবার একটা সিগারেট ধরাল। মহীদা তাকে দেখলে কতটা চমকে যাবে বলা যাচ্ছে না। বোধহয় বিশ্বাসই করতে পারবে না, নীলেন্দু স্বেচ্ছায় এখানে এসেছে। অন্য রকম ভাবতে পারে মহীদা। ভাবাই স্বাভাবিক। ভেবে সন্ত্রস্ত হবে, নীলেন্দুকে মোটেই পছন্দ করবে না, বিশ্বাস করবে না।

নীলেন্দু মহীতোষের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। কোন দিক দিয়ে মহীতোষ আসবে বুঝতে না পেরে সে একবার ঘরের দিকে আর

একবার ভেতর বারান্দার জাফরির দরজার দিকে তাকাচ্ছিল। ভেতর বারান্দার সবটাই জাফরি আর জাল দিয়ে ঘেরা, বাইরে চৌকো জাল, কাঠের ফ্রেমে আটকানো; ভেতর দিকে পাতলা গোল জাল।

ঘরের ভেতর দিয়েই মহীতোষ এল। নীলেন্দুকে দেখে থমকে দাঁড়াল। দেখল দু পলক। এগিয়ে এল। "নীলু! তুই?"

নীলেন্দু মহীতোষকে দেখতে লাগল। প্রায় ছ'সাত মাস পরে দেখা। মনে মনে নীলেন্দু অন্য রকম ভেবেছিল। ভেবেছিল, মহীদার মুখে ঘন দাড়ি, পরনে গেরুয়া, মাথায় লম্বা লম্বা বাবাজী মার্কা চুল দেখতে পাবে। সে-সব কিছুই দেখা গেল না। মাথার চুল অবশ্য বড় বড়, কিন্তু তাকে বাবাজী মার্কা বলা যায় না।

কাছে এসে মহীতোষ নীলেন্দুর কাঁধের কাছটায় হাত রেখে চাপ দিল। "তুই কি করে এলি? আমি ভেবেছিলাম অন্য কেউ!"

"কোন দিকে ছিলে তুমি? আমি তো দেখতে পাই নি!"

মহীতোষ বাড়ির পেছন দিকটা দেখাল। বলল, "তুই সামনে দিয়ে এসেছিস, আমি পেছনের দিকে মাঠে বেড়াচ্ছিলাম। খানিকটা দূরে একটা ছোট নদী আছে। হাঁটতে হাঁটতে নদী পর্যন্ত চলে যাই। ফেরার মুখে শুনলাম কোন এক বাবু এসেছে।"

"তাই বলো! তোমায় খবর পাঠিয়েছিল দেবীদি!"

"কেমন আছিস তুই?"

"কেমন দেখছ। তুমি কেমন আছ?...তোমরা?" নীলেন্দু যেন একটু হাসল।

মহীতোষ চেয়ারে বসল। দেবযানী চা এনেছে। দু কাপ। মহীতোষের সামনে একটা কাপ নামিয়ে রেখে বলল, "তোমরা বসো, আশিসকে চা দিয়ে আসি।"

নীলেন্দু চা খেতে খেতে মহীতোষকে লক্ষ করতে লাগল।

মহীতোষ চায়ের পেয়ালা টেনে নিয়ে চুমুক দিল। মুখ তুলে বলল, "কি দেখছিস ?"

"দেখছি তোমার কতটা পরিবর্তন হল ?"

মহীতোষ শান্ত চোখে হাসল। "কিছু দেখতে পাচ্ছিস ?"

সিগারেটের ধোঁয়া গিলে ফেলল নীলেন্দু। "তেমন আর কোথায়! গায়ের রঙ প্রায় আমার মতনই হয়ে এসেছে, চোখেমুখেও তো কোনো দিব্য জ্যোতি দেখছি না, বরং তোমার শরীর খানিকটা শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে!" নীলেন্দু এমনভাবে বলল যেন সে যা বলছে তার সম্পর্কে নিজেও তেমন নিশ্চিত নয়। তার মুখে সামান্য হাসি-হাসি ভাব ছিল।

মহীতোষ হাসছিল। বলল, "শীতে শরীর শুকোয় তুই জানিস না ?"

নীলেন্দু মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "না ওসব জানি না।...কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি অবাক হচ্ছি, মহীদা; আমি ভেবেছিলাম তুমি এতদিনে দিব্যি দাড়িফাড়ি গজিয়ে ফেলবে, মাথার চুল হাত-খানেক লম্বা হবে। সেসব কোথায় ?"

মহীতোষ সামান্য জোরে হেসে উঠল।

দেবযানী ফিরে এসে রান্নাঘরে গিয়েছিল, তার চা নিয়ে নীলেন্দু-দের কাছে এসে বসল।

মহীতোষ বলল, "দেবী, আমার এই মুখ নীলুর পছন্দ হচ্ছে না।"

দেবযানী নীলেন্দুর দিকে তাকাল।

নীলেন্দু বলল, "মিথ্যে বলব না দেবীদি, যেখানে যা মানায় তা না থাকলে চোখে লাগে। তোমাদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, এখানকার কারবারটা তোমরা গুছিয়ে উঠতে পারো নি।"

নীলেন্দুর গলার শ্লেষ দেবযানীর কানে লাগল। মহীতোষেরও হয়ত লেগেছিল। কিন্তু তার মুখ সহাস্যই থাকল। দেবযানী যেন

ক্ষুণ্ণ হল। বলল, "তুমি কি আমাদের কারবারের লাভক্ষতি দেখতে এসেছ?"

মহীতোষ দেবযানীর মুখের দিকে তাকাল। মনে হল এই বিরক্তি তার পছন্দ হল না।

নীলেন্দু সিগারেটের শেষ ধোঁয়াটুকু গিলে ফেলে স্বাভাবিক গলায় বলল, "তুমি তো জান দেবীদি, আমি জাত ব্যবসাদারের ছেলে, লাভের কারবার দেখলে আমার লোভ বেড়ে যায়, ইচ্ছে করে দু পয়সা খাটিয়ে নি।" বলে নীলেন্দু হাসতে লাগল।

মহীতোষ প্রসঙ্গটা পালটে নেবার জন্যে বলল, "তোদের দু জনের সেই সাপে-নেউলের সম্পর্কটা আর শোধরাল না।...ও সব কথা থাক্, এবার আমায় বল তো নীলু, তুই কি করে জানলি আমরা এখানে আছি?"

সিগারেটের টুকরোটা কাপের মধ্যে ফেলে দিল নীলেন্দু। সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "কানে এসেছিল।"

"কি করে কানে এল?"

"গিরিজা বলছিল। সে নাকি শুভঙ্করের কাছে শুনেছে। বাসুদেবের কাছেও শুনে থাকতে পারে। তুমি কি তোমার ভাইকে কোনো চিঠি লিখেছিলে?"

"লিখেছি এক-আধ বার।"

"তার মুখ থেকেও শুনতে পারে।"

"তুই কি আমার বাড়িতে খোঁজ করেছিলি?"

"না।...খোঁজ করলে লাভ হত বলে আমার মনে হয় নি। আমি উড়ো খবর শুনেই এসেছি। তোমাদের এখানে সত্যিসত্যি দেখতে পাব ভাবি নি। ভেবেছিলাম, নাও পেতে পারি। না পেলে ফিরে যেতাম।"

দেবযানী মুখ নীচু করে চা খাচ্ছিল। মুখ গম্ভীর। অন্যমনস্ক।

মহীতোষ বলল, "তুই ভুল করেছিস। আমার বাড়িতে গিয়ে

খোঁজ করলে এখানকার কথা তুই জানতে পারতিস। পরিতোষ তোকে অন্তত বলত।"

"দেবীদির বাড়িতে বলে নি," বলে নীলেন্দু দেবযানীর দিকে তাকাল।

মহীতোষ বলল, "দেবীর বাড়ির লোক জানে না। জানলেও বলত না! কেন বলত না তুই জানিস। তা ছাড়া তারা বোধ হয় জানতেও চায় না।"

দেবযানী বলল, "তারা কিছু জানে না।"

নীলেন্দু বলল, "তোমার নাম ও বাড়িতে অচল এটা তুমি জান? তুমি বেঁচে আছ না মরে গেছ এটাও ওরা জানতে চায় না।"

দেবযানী উদাসীন ভাবে বলল, "জানি। আমি ওদের কেউ নই।"

নীলেন্দু আচমকা বলল, "তুমি কত টাকার গয়না নিয়ে পালিয়ে এসেছ দেবীদি? শুনেছি মোটা টাকার। আজকালকার বাজারে পনেরো বিশ হাজার হতে পারে। পাথরটাথরও ছিল।"

দেবযানী প্রথমটায় কথা বলল না, নীলেন্দুর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর আস্তে করে বলল, "আমি যা এনেছি সব আমার। আমার মা দিদিমা আমার জন্যে যা রেখেছিল। বাড়ির কারও কোনো জিনিস আমি নিই নি। বরং আমারই খুচরো কিছু আমি ফেলে এসেছি।"

মহীতোষ দেবযানীকে দেখছিল। অসন্তুষ্ট হয়েছে দেবযানী। চোখের তলায় রাগের ভাব। কপাল সামান্য কুঁচকে উঠেছে।

মহীতোষ নীলেন্দুকে বলল, "নীলু, তুই দেবীকে রাগিয়ে দিচ্ছিস।"

নীলেন্দু দেবযানীকে দেখতে দেখতে হাসল, বলল, "আমার ওপর রাগ করার কোনো কারণ নেই, মহীদা। আমি যা শুনেছি তাই বললাম। দেবীদি আমায় দেখে রাগ করছে না। করছ নাকি

দেবীদি ?” নীলেন্দু ঠাট্টা করে বলল।

কথার জবাব দিল না দেবযানী।

নীলেন্দু বলল, “আমায় দেখে দেবীদির যা হয়েছে আমি বুঝতে পারছি। ভয় পেয়েছে।” বলে একটু থামল, আবার বলল, “একটা কথা আমি সত্যি করেই বলছি মহীদা, দেবীদি যা ভাবছে তা নয়। আমায় কেউ তোমাদের কাছে পাঠায় নি। আমি নিজেই এসেছি। কেউ জানে না, আমি তোমাদের কাছে আসব। কাউকে আমি বলি নি।”

দেবযানী স্থির চোখে নীলেন্দুকে দেখছিল।

চুপচাপ। মহীতোষ গায়ের চাদরের আলগা অংশটা মাটি থেকে গুটিয়ে নিতে নিতে বলল, “বাইরে গিয়ে বসি চল নীলু, বাইরের বারান্দায় রোদ এসে গেছে।”

## দুই

বারান্দার গায়ে গায়ে পেয়ারা গাছ, গাছতলাতেই বসল মহীতোষ ছোট ছোট মোড়া বয়ে এনে। পুরোপুরি রোদের মধ্যে বেশীক্ষণ বসা যাবে না ভেবেই মাথা বাঁচিয়ে গাছতলায় বসা।

নীলেন্দু প্রথমটায় কোনো কথা বলল না, আলস্যের ভঙ্গিতে বসে চারপাশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। আকাশ পরিষ্কার, ফিকে নীল, সাদা রেখার মতন মেঘের দাগ রয়েছে কোথাও কোথাও; অফুরন্ত রোদ। রোদ যে অনেক গাঢ় ও তপ্ত হয়ে গেছে বোঝা যায়। মাটি ঘাস শুকিয়ে এসেছে, ভেজা ভেজা ভাবটা আর তেমন চোখে পড়ছিল না।

মহীতোষই কথা বলল। “জায়গাটা কেমন লাগছে রে ?”

নীলেন্দু মহীতোষের দিকে তাকাল। হাসি মাখানো নিশ্চিন্ত মুখ।

নীলেন্দু আশা করেছিল, তাকে দেখে মহীদার মুখ গম্ভীর হয়ে যাবে, দেবীদির যেমন হয়েছে ; মহীদা বিরক্ত হবে, উদ্বেগ বোধ করবে। আশ্চর্য, এখন পর্যন্ত তেমন কিছু হল না। মহীদা যদি উদ্বেগ বোধ করেও থাকে তার কোনো চিহ্ন মুখে ফুটে ওঠে নি। শুধু কৌতূহলের কিছুটা আভাস রয়েছে চোখে।

নীলেন্দু বলল, "জায়গাটা ভালই বেছে নিয়েছ। কি করে বাছলে ? এদিকে আগে এসেছ কখনও ?"

মহীতোষ বলল, "একবার এসেছিলাম। বছর চারেক আগে।"

"তখন থেকেই কি তোমার মাথায় এই আখড়া খোলার প্ল্যান ছিল ?"

হাসল মহীতোষ। মাথা নাড়ল। "না রে, তখন কিছুই ছিল না।"

"এই বাড়িটার মালিক কে ?"

"দেবী।"

নীলেন্দু অবাক হয়ে মহীতোষকে দেখতে লাগল। এক-আধবার এই ধরনের একটা সন্দেহ তার হয়েছে, তবে সে-সন্দেহ এমনই যে নীলেন্দু তা নিয়ে মোটেই ভাবে নি। তার মনে হয়েছিল, বাড়িটা মহীদারা ভাড়া নিয়েছে।

মহীতোষ নিজেই বলল, "দেবী বাড়িটা কিনেছে। বেশীদিন নয়, মাস-দুই হল। এখানে জমি জায়গা সস্তা, বাড়িটাও ফাঁকা পড়ে ছিল, খুবই অল্প পয়সায় কিনে নিয়েছে।"

নীলেন্দু অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞেস করল, "বাড়িটা কার ?"

"বাড়িটা ছিল এদিককারই এক অবাঙালী ভদ্রলোকের। কাঠের ব্যবসা করতেন। এদিকে ওদিকে আরও দু একটা বাড়ি তাঁর আছে। ভদ্রলোকের স্ত্রীর বাড়াবাড়ি ধরনের টি বি হয় ; হাসপাতালে অনেকদিন ছিলেন। সেরে ওঠার পর স্ত্রীকে শুকনো ভাল জায়গায় রাখার জন্যে বাড়িটা করেন। বছর-দুই পরে মহিলা অন্য রোগে

মারা যান, হার্টের রোগে। তারপর থেকে বাড়িটা ফাঁকা পড়ে ছিল। ওই যে আশিস, ওরই এক বন্ধু ভদ্রলোকের ভাগ্নে। ঝাড়গ্রামে ভদ্রলোকের অন্য সব ব্যবসা আছে। আশিসই খবরাখবর করেছিল। এই বাড়িটা রাখার ব্যাপারে ভদ্রলোকের কোনো গরজ ছিল না। হাজার আষ্টেক টাকায় বেচে দিলেন।"

নীলেন্দু মন দিয়ে শুনছিল। মহীদারা কি তাহলে কলকাতা থেকে চলে আসার পর ঝাড়গ্রামে ছিল।

নীলেন্দু বলল, "তোমরা কি আগে ঝাড়গ্রামে ছিলে?"

"ছিলাম কিছুদিন। তারপর এখানে চলে আসি। এই বাড়িতেই। ভাড়াটে ছিলাম।"

নীলেন্দু গলার মাফলারটা খুলে ফেলল। শরীর তেতে উঠেছে রোদে। মাথাটা আরও একটু ছায়ার দিকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে আরাম করে বসল। বসে পায়ের জুতো মোজা খুলতে লাগল।

মহীতোষ গায়ের গরম চাদর কোলের কাছে গুটিয়ে নিয়ে বসেছিল। শান্ত ভাবেই। এখন বাতাস নেই। পেয়ারাগাছের পাতা যেন স্থির হয়ে আছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস বইতে শুরু করবে; আজ ক'দিন দুপুর থেকে শীতের হাওয়ার দমকা বাড়ছে, বিকেলের পর প্রবল হয়ে ওঠে। শীতও ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

নীলেন্দু আয়াস করে বসে সিগারেট ধরাল। তারপর কি মনে করে মহীতোষের দিকে তাকিয়ে হেসে সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিল।

মহীতোষও হাসল। মাথা নাড়ল।

"সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছ?" নীলেন্দু ঠাট্টার গলায় বলল।

"হ্যাঁ। অনেক দিন।"

"কেন? সাধু সন্ন্যাসীদের অনেকেই তো বিড়ি সিগারেট গাঁজা আফিং খায়!"

"আমি তো সাধু সন্ন্যাসী নই।"

"বাঃ," নীলেন্দু মজার গলায় শব্দ করল। তুমি তো ওই লাইনে এসেছ।...একটা সিগারেট খেতে দোষ কি! একসময়ে পর পর খেতে।"

"দোষ কিছুই নেই; আমি ছেড়ে দিয়েছি।"

"কেন? ক্যানসারের ভয়ে?"

"না—"মহীতোষ ঘাড় নাড়ল। "নিজের জন্যে খরচ কমিয়েছি।"

"আচ্ছা, তা হলে খরচের কথা ভাবছ—" নীলেন্দু পরিহাস করেই বলল।

মহীতোষ একটু চুপ করে থেকে বলল, "না ভাবলে চলবে কেন? এখানে আমার আয় কি বল? খাওয়া পরা চালাবার মতন ব্যবস্থাটুকু আগে করতে হবে, বাকিতে আমার কি প্রয়োজন?"

নীলেন্দু বড় বড় টান দিল সিগারেটে, মহীতোষের চোখ ভাল করে লক্ষ করতে করতে বলল, "মহীদা, তুমি আমার কাছে খোলাখুলি কটা কথা বলবে?

"কেন বলব না!"

"বেশ, তা হলে সত্যি সত্যি বলো, এই বাড়ি কি দেবীদি নিজের টাকায় কিনেছে?"

"হ্যাঁ।"

"টাকা পেল কোথায়? গয়নাগাটি বেচেছে?"

মহীতোষ স্বীকার করল, দেবযানী গয়নাগাটি বেচেছে। "আমি দেবীকে বারণ করেছিলাম; আমার ততটা ইচ্ছে ছিল না। ভেবেছিলাম পরে কিনলেই হবে। দেবী জেদ করে কিনে ফেলল। লাভের মধ্যে এই হল, ওর অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল।"

নীলেন্দু যেম মনে মনে হিসেব কষে বলল, "দেবীদির বাড়ির হিসেব মতন যত গয়নাগাটি পাথর-টাথর নিয়ে চলে এসেছে দেবীদি

তাতে আমার মনে হয় বাড়ি কেনার পরও বেশ কিছু থাকার কথা। তাই না?"

"কিছু আছে," মহীতোষ অস্বীকার করল না, বলল, "আমি সব খবর রাখি না, তবে দেবী কিছু সঞ্চয় রেখেছে। এখানকার ছোট পোস্ট অফিসে রাখতে হয় পেটের জন্যে, বাকিটা ঝাড়গ্রামে ব্যাঙ্কে রেখেছে।"

নীলেন্দু সামান্য অবাক হচ্ছিল। এতো খোলাখুলি কথা মহীদা বলবে সে ভাবে নি। একটা সময় মহীতোষের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক ছিল যে ধরনের ঘনিষ্ঠতা তাতে মহীদা তার কাছে কোনো কিছুই গোপন রাখত না। সে সম্পর্ক এখনও থাকবে এমন কথা নয়। এবং না থাকারই কথা। মহীদার কাছে গোপনতাই এখন প্রত্যাশা করা যায়। বিশেষ করে এই টাকা পয়সার কথায়—যে টাকা পয়সা তার নিজের নয়, দেবীদির। দেবীদির অনুগ্রহে মহীদার দিন কাটছে—এই কথাই স্বীকার করতে তার সঙ্কোচ হওয়া স্বাভাবিক ছিল। মহীদা কিন্তু অসঙ্কোচ।

নীলেন্দু অন্যমনস্কভাবে সিগারেট শেষ করতে লাগল। [illegible] আচমকা বলল, "তোমারও তো কিছু থাকার কথা।"

মহীতোষ [illegible] মাথায় [illegible] থাকল [illegible] মুহূর্ত [illegible] কোনো কিছুই আমি চাই নি, শুধু পুরোনো বাড়ির আমার [illegible] অংশটা বেচে দিতে বলেছি। ইচ্ছে করলে পবিতোষ [illegible] নিতে পারে। না হলে বেচে দিক। বেচে দেবার কোনো অসুবিধাই নেই। ...আমার কিছু টাকা দরকার, নীলু; এখানে আমি একটা কাজ করব ভেবে রেখেছি।"

নীলেন্দু চুপ করে থাকল। সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল ছুঁড়ে। আশিস একবার বারান্দায় এসেছিল। এখন তাকে কুয়া-তলার দিকে দেখা যাচ্ছে। কোমরে গামছা জড়ানো, হাতে একটা

সাদা লুঙ্গি, বোধ হয় স্নান করতে এসেছে। দশটার গাড়ি ধরবে।

রোদে বসে থাকতে থাকতে সামান্য রুক্ষ লাগছিল। ধুলোর কোনো গন্ধ নেই। অন্য ধরনের টাটকা গন্ধ লাগছিল নাকে। গাঁদা ফুলের ঝোপ রোদে বেশ উজ্জ্বল। আকাশের অনেক উঁচুতে চিলটিল উড়ছে।

হাই তুলল নীলেন্দু শব্দ করে, দু হাত মাথার ওপর তুলে, দুপাশে ছড়িয়ে আলস্য ভাঙল। তারপর বলল, "আমায় হঠাৎ এখানে দেখে তুমি কি ভাবছ, মহীদা?"

মহীতোষ কোনো জবাব না দিয়ে শান্ত চোখে নীলেন্দুকে দেখতে লাগল। তার চোখ দেখে বোঝা যায় না, কি ভাবছে মহীতোষ!

"আমার প্রায়ই মনে হত, তুই একদিন আসবি," মহীতোষ বলল। "দেবীকে আমি বলতাম।"

"তোমার কেন মনে হত?"

মহীতোষ সরলভাবে বলল, "কেন মনে হত তুই নিজেই জানিস।"

"দেবীদি আমায় দেখে খুশী হয় নি। ভয় পেয়েছে।"

"ঠিক তোকে দেখে দেবার অসুখী হবার কথা নয়। তুই দেবীর ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ। ও অন্যদের কথা ভেবে ভয় পাচ্ছে হয়ত।" মহীতোষ নীলেন্দুর চোখের দিকে এমন করে তাকাল যেন এই সহজ ব্যাপারটা নীলেন্দুর না বোঝার কথা নয়।

নীলেন্দু চুপচাপ থাকল। মহীদার কথায় আপত্তি করার বিশেষ কিছু নেই। তবু তার মনে হচ্ছিল, দেবীদি পুরোপুরি নীলেন্দুকে বিশ্বাস করে নি। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে বিশ্বাস করাও কঠিন। নীলেন্দুও আশা করে নি দেবীদি তাকে দেখে দু হাত বাড়িয়ে টেনে নেবে।

খানিকটা অপেক্ষা করার পর নীলেন্দু বলল, "মহীদা, তোমার কি মনে হচ্ছে?"

"কিসের?"

"এই যে আমি হঠাৎ ধূমকেতুর মতন তোমাদের কাছে হাজির

বলাম···।"

মহীতোষ দু মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "আমি তো আগেই বলেছি, আমার মন বলছিল—তুই একদিন এসে পড়বি।"

"তোমার মন কি বলছিল সে কথা পরে হবে; আমি এভাবে এসে পড়ায় সন্দেহ হচ্ছে না?"

নীলেন্দুর চোখে চোখে তাকিয়ে মহীতোষ বলল, "খানিকটা হচ্ছে।"

"কিন্তু তুমি তো বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছ। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, একেবারেই ঘাবড়াও নি?"

মহীতোষ হাসির মুখ করল। বলল, "তোকে দেখে অন্তত ঘাবড়াই নি।"

নীলেন্দু আচমকা বলল, "আমি কেন এসেছি জান?"

"না।"

"আন্দাজ করতে পারছ না?"

"তুই তো বলেছিস নিজের ইচ্ছেয় এসেছিস।"

মাথা নেড়ে নীলেন্দু বলল, "হ্যাঁ, আমি নিজের ইচ্ছেয় এসেছি। আমায় কেউ পাঠায় নি। কেউ জানে না আমি তোমাদের কাছে আসছি।"

"তা হলে আমার ভাববার···"

"দাঁড়াও, আমার কথা শেষ করতে দাও। আমি নিজের ইচ্ছেয় এসেছি মানে এই নয় যে তুমি এতটা নিশ্চিন্ত থাকতে পার। এমনও তো হতে পারে, তোমার সঙ্গে আমি একটা বোঝাপড়া করতে এসেছি।" নীলেন্দু স্পষ্ট ও সামান্য জেদি চোখে মহীতোষের দিকে তাকিয়ে থাকল।

মহীতোষ একটু যেন ভাবল। তারপর বলল, "তোর একার সঙ্গে যদি বোঝাপড়া করার কিছু থাকে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি। অন্য কারও সঙ্গে বোঝাপড়ার কিছু নেই আমার। তুই

ভুলে যাস না, আমি শুভঙ্করদের সকলের সামনেই আমার যা বলার বলে এসেছি। কলকাতা থেকে আমি পালিয়ে আসি নি; চলে এসেছি। আমার খবরাখবর তোদের জানানোর কোনো দরকার ছিল না বলে জানাই নি। তাছাড়া দেবী চাইত না আমাদের খবর কাউকে দি। শুভঙ্করদের কাছে আমার কৈফিয়ত দেবার কিছু ছিল না, আজও নেই। ওদের সঙ্গে আমার বোঝাপড়ার কথা ওঠে না।”

নীলেন্দু মহীতোষকে দেখতে থাকল। এই প্রথম মহীতোষকে সামান্য বিরক্ত দেখাল। বিরক্ত এবং কিছুটা কঠিনও। নীলেন্দু আরও বেশী দেখেছে: সে জানে মহীদা প্রয়োজনে কত বেশী রূঢ়, জেদি, তিক্ত, নিষ্ঠুর হতে পারে। মানুষের চরিত্রের প্রতিটি খুঁটিনাটি জানা সম্ভব নয়, কিন্তু দীর্ঘদিনের অন্তরঙ্গতায় নীলেন্দু মহীতোষের চরিত্রের অনেকটাই জানে, তার দুঃসাহস এবং দুর্বলতাও। যে-কোনো কারণেই হোক মহীতোষের এই ঈষৎ রূঢ়তা নীলেন্দুর ভাল লাগল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নীলেন্দু বলল, “বেশ, বোঝাপড়াটা তোমার আমার মধ্যেই হবে।”

মহীতোষ এমন করে মাথা হেলাল যাতে মনে হল তার কোনো আপত্তি নেই।

অনেকক্ষণ একই ভাবে রোদে বসে থাকতে গরম লাগছিল নীলেন্দুর। পুলওভারটা খুলে ফেলল। কুয়াতলায় আশিসের স্নান হয়ে গেছে। সকালের দিকে বারান্দার পুব ঘেঁষে রোদ নেমেছিল অল্প, এখন অর্ধেক বারান্দাই রোদে ভরা। মাটি ক্রমশই উষ্ণ হয়ে উঠছে। বাতাসে বিন্দুমাত্র আর্দ্রতা নেই। সবই কেমন স্বচ্ছ, উজ্জ্বল।

দেবযানী বারান্দায় এল। দেখল।

পেয়ারাতলার কাছাকাছি বারান্দার ধারে এসে নীলেন্দুকে বলল, “তুমি হাত মুখ ধোবে না? এসো। মুখচোখ ধুয়ে একটু কিছু খেয়ে নাও।”

মহীতোষেরও যেন হঠাৎ খেয়াল হল, বলল, "তাই তো নীলু, তোর তো সকালে মুখ ধোওয়াই হয় নি। ওঠ। জামাটামা ছাড়। হাতমুখ ধুয়ে নে। কুয়োর জলে খুব ফ্রেশ লাগবে।"

নীলেন্দু তার পুলওভারটা কাঁধের ওপর ফেলল; পিঠ নুইয়ে জুতো মোজা তুলে নিল বাঁ হাতে, ঠাট্টা করে বলল, "দেখি কতটা লাগে!"

হাতমুখ ধুয়ে নীলেন্দু ভেতর বারান্দায় এসে বসল। প্যান্ট ছেড়ে পাজামা পরেছে। গায়ে হাফ হাতা সোয়েটার।

দেবযানী সকালের জলখাবার এনে দিল। লাল আটার রুটি উনুন থেকে সদ্য তোলা; বেগুন আর কড়াইশুঁটির তরকারি।

নীলেন্দু খেতে খেতে বলল, "বাঃ, তোমাদের এখানে রান্নার তো বেশ স্বাদ আছে।"

দেবযানী দাঁড়িয়ে ছিল, বলল, "শাকসবজিরও খুব স্বাদ।"

মাথা নেড়ে স্বীকার করে নীলেন্দু বলল, "তা তো হবেই; মাটির গুণ। আমি একবার রাঁচির দিকে শীতকালে মাসখানেক ছিলাম। শীতের শাকসবজি যে খেতে কত সুস্বাদু হয় তখনই বুঝেছি।"

দেবযানী বলল, "এসব আমাদের বাগানের।"

চোখ তুলল নীলেন্দু। "তোমাদের বাড়ির বাগানের?"

দেবযানী বলল, "কুয়োতলার ও পাশটা তুমি দেখো নি, তোমার মহীদা ছোটখাট সবজি ক্ষেত করেছে।"

বাড়ির চারপাশ নীলেন্দুর এখনও দেখা হয়ে ওঠে নি, পরে সবই সে দেখে নেবে। কিন্তু মহীদা সমস্ত কিছু ছেড়েছুড়ে এসে এখানে এক টুকরো সবজি ক্ষেত নিয়ে বসে আছে ভাবতেই তার হাসি পাচ্ছিল।

দেবযানী বলল, "তুমি খাও, আমি চা নিয়ে আসি।"

রান্নার দিকে যাবার আগে দেবযানী ভেতর ঘরের চৌকাটে দাঁড়িয়ে

আশিসকে ডাকল। আশিসের সময় হয়ে আসছে গাড়ির, জলখাবার খেয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হবে।

আশিস এল! প্রথমে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল, তারপর নীচু গলায় কিসের কথাবার্তা সেরে নীলেন্দুর দিকে টেবিলের সামনে এগিয়ে এল।

নীলেন্দু সহাস্য চোখে আশিসকে দেখল। কোনো কোনো মানুষকে প্রথম নজরেই মোটামুটি আঁচ করা যায়। নীলেন্দু যেন আশিসকে আগেই আঁচ করে ফেলেছিল। বেশী রকম লাজুক, বয়েসে সাবালক হলেও মনে এখনও ঠিক সাবালক হয়ে ওঠে নি; নরম চেহারা, স্বভাবও নরম গোছের; চোখের দিকে তাকালে বেশ বোঝা যায়—সংসারের অনেক কিছুর সঙ্গে তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ নয়।

আশিস বসল।

নীলেন্দু আলাপ করার ভঙ্গিতে বলল, "দশটায় গাড়ি?"

আশিস মাথা নাড়ল আস্তে করে।

"কতক্ষণ লাগে ঝাড়গ্রাম যেতে?"

"মিনিট চল্লিশ।"

"ঝাড়গ্রাম শুনেছি ভাল জায়গা। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ট্রেনিং কলেজ অনেক কিছু আছে।"

আশিস যেন একটু খুশী হল।

"আপনি কি করেন, ভাই?" নীলেন্দু জিজ্ঞেস করল।

"কোর্টে চাকরি করি। ক্লার্ক।"

"ও!...বাড়ি ওখানেই?"

মাথা হেলিয়ে আশিস বলল, হ্যাঁ—ঝাড়গ্রামেই তাদের বাড়ি।

ততক্ষণে দেবযানী এসেছে। এক হাতে আশিসের জলখাবার, অন্য হাতে নীলেন্দুর জন্যে চা। টেবিলের ওপর খাবার চা নামিয়ে দিয়ে আবার রান্নাঘরের দিকে চলে গেল, ফিরে এল জলের গ্লাস

নিয়ে। আশিসের জন্যে চা নিয়েও এসেছে।

খেতে খেতে সাধারণ কথাবার্তা হচ্ছিল : এদিককার শীতের কথা, শাকসবজির কথা, জঙ্গলের কথা, কোথায় কোন পাহাড় আছে তার গল্প, আরও এলোমেলো কিছু কথাবার্তা।

শেষে আশিস উঠল।

দেবযানীও উঠে পড়ল। বোধ হয় আশিসকে কিছু বলবে।

নীলেন্দু কিছুক্ষণ বসে থাকল। সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছিল। প্যাকেট দেশলাই ঘরে পড়ে আছে। এ সময় ঘরে যেতে ইচ্ছে করছিল না। দেবীদি আশিসের সঙ্গে হয়ত ব্যক্তিগত কথা বলছে, নীলেন্দুকে দেখলে কিছু মনে করতে পারে। নীলেন্দুর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, দেবীদি এখন পর্যন্ত তাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। দেবীদির চোখ, তার ব্যবহার, ভাবভঙ্গি স্পষ্টই বলে দিচ্ছে—সে বেশ সন্দিগ্ধ, খানিকটা যেন উতলা, বিভ্রান্ত! এই উতলা ভাবটা দেবীদি চেপে রাখার চেষ্টা করেও পারছে না।

নীলেন্দুর কেমন যেন মজা লাগছিল। কে বলবে, কিছুদিন আগে এই দেবীদির সঙ্গে তার যে ধরনের সম্পর্ক ছিল তাতে এ রকম কোনো আকস্মিক সাক্ষাৎ ঘটে গেলে দেবীদি আহ্লাদে গলে যেত। গলা জড়িয়ে ধরত দু হাতে, মুঠো করে মাথার চুল ধরে টানত, কথা বলত অনর্গল, হাত ধরে টেনে নিয়ে ঘুরে বেড়াত, হুকুম করত, জ্বালাতন করত—অর্থাৎ যে সহজ আন্তরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মানুষকে উৎফুল্ল ও আতিশয্যময় করে তোলে দেবীদির আচরণে সেটা দেখা যেত। এ ধরনের ছেলেমানুষি অজস্রবার করেছে দেবীদি, সামান্য কারণেই। কিন্তু এখন তার কোনো লক্ষণই নেই।

টেবিল থেকে উঠে পড়ল নীলেন্দু। ভেতর বারান্দার জাফরির দরজা ভেজানো ছিল। খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। কুয়াতলায় কেউ নেই। দুটো কাক আর কয়েকটা শালিক ওড়াউড়ি করছে। রোদ কড়া হয়ে উঠছিল। পায়ের তলায় কাঁকর মেশানো মাটি,

সামান্য ঘাস দু পাশে, শীতে মরে আসছে। একদিকে একটা বড়সড় আতাগাছ।

নীলেন্দু কুয়াতলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ছোট করে বাঁধানো কুয়াতলা। কুয়া দেখল ঝুঁকে। মনে হল, গভীরতা কম নয়; জলে কিছু পাতা পড়ে আছে, বাতাসে উড়ে আসা পাতা। আশিস বোধ হয় চলে গেল, দেবীদি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি যেন বলল।

কুয়াতলার পাশ দিয়ে বাড়ির পেছন দিকে আসতেই ছোটখাট সবজি ক্ষেত চোখে পড়ল নীলেন্দুর। বাড়ির মধ্যে বাগান, তবু শুকনো কাঠকুটো, কোথাও কোথাও বা কাঁটাগাছের বেড়া। বাড়ির জোয়ান লোকটা বাগানে কাজ করছিল! নীলেন্দুর বাগান সম্পর্কে কোনো বিশেষ উৎসাহ না থাকলেও বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে শাক-সবজি দেখতে লাগল। কিছুই প্রায় বাদ নেই। একপাশে পালং শাক, অন্য দিকে বেগুন, ছোট ছোট কপি হয়ে রয়েছে, সারা রাতের ঠাণ্ডা আর হিমে কপির পাতা কেমন সতেজ সাদাটে সবুজ দেখাচ্ছিল। কড়াইশুটির গাছগুলো আশ্চর্য মোলায়েম নরম। সবজি ক্ষেতের গন্ধ উঠছিল।

নীলেন্দু ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই দেবযানীকে দেখতে পেল।

"আশিস চলে গেল?" নীলেন্দু জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ...তুমি এখানে?"

"তোমাদের সবজি বাগান দেখছি।"

"দেখো। এই বাগান তোমার মহীদার।"

"মহীদার এই বিদ্যেও জানা ছিল জানতাম না," নীলেন্দু হাসল।

"বিদ্যের, আর কি—"দেবযানী বলল, "ও তো সব জানে—ওই লাটু; ক্ষেতখামারের কাজ জানে। ওই সব করে।" বলে একটু থামল, তারপর বলল, "আমাদের একরকম এতেই চলে যায়।"

নীলেন্দু চোখ তুলে দেবযানীকে দেখল। "হাটবাজার করতে হয় না?"

"হয়, কিছু কিছু করতে হয়—; হাট থেকে আলুটালু আনতে হয়, সামান্য শাক-সবজিও। তবু বেশীর ভাগটা এখান থেকেই কুলিয়ে যায়।"

নীলেন্দু কি মনে করে হেসে বলল, "তোমরা দেখছি কৃচ্ছ্রতা সাধনের ব্রত নিয়েছ।"

দেবযানী যেন প্রথমে কথাটা বোঝে নি ; পরে বুঝে বলল, "তা বলতে পার। আমাদের হাতে তো অঢেল পয়সা নেই। যতটা পারি খরচপত্র কমিয়ে চলবার চেষ্টা করি।"

নীলেন্দু দেবযানীকে লক্ষ করছিল। আন্তরিকভাবে বলল, "তোমার এমন অভ্যেস ছিল না। হাত টেনে করে চলেছ আমি মনে করতেও পারি না। অভাব, দুঃখ, কায়ক্লেশ সহ্য করার ক্ষমতা তোমার আছে—একথা ভেবে অবাক হচ্ছি।"

দেবযানী সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "অবাক হবার কিছু নেই ; আমায় তুমি উড়োনচণ্ডে স্বভাবের করে দেখলে!…যাক্‌গে, ধরে নাও অবস্থা আমার স্বভাব বদলেছে।"

"তাই দেখছি। যাকে কোনোদিন রান্নাঘরের চৌকাটে দাঁড়াতে দেখি নি, তাকে [illegible] বেলছে।"

দেবযা[illegible] তোমার বাড়াবাড়ি ; মেয়েরা রান্নাঘরে[illegible] মেয়ে আমাদের দেশে দেখবে না। [illegible] বসার দরকার করত না, এখন [illegible]া ছাড়া এমন তো কিছু নয়, দুটো ডালভাত সামান্য [illegible]া পারলে মেয়েদের লজ্জা রাখার জায়গা থাকে না।"

[illegible] মনে করে কৌতূহলের সঙ্গে বলল, "তোমরা কি মাছ [illegible]হ?"

[illegible] ওঠে না।"

[illegible]জবাব হল না, এড়িয়ে যাওয়া উত্তর হল।"

দেবযানী বাগানের লাটুকে কিছু শাক-সবজি তুলতে বলে

নীলেন্দুর দিকে তাকাল। বলল, "এখানে মাংস পাওয়া যায় না; মাছ বলতে নদীর ছোট ছোট মাছ; ডিম অবশ্য গাঁয়ে পাওয়া যায়। আমি কোনো কোনোদিন পেলে খাই। ও খায় না।"

"মহীদা খায় না, তুমি খাও—মানে? সধবার আচার নাকি?"

দেবযানী কেমন বিব্রত বোধ করল। "তুমি যদি তাই ভাব, তবে তাই। কিন্তু এমন আচার কেউ আমায় পালন করতে বলে নি।"

নীলেন্দু খুব আচমকা জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কোথায় গিয়ে বিয়ে করেছিলে দেবীদি? কালীঘাটে?"

"না," দেবযানী বলল।

"তবে?"

"আচার করে আমাদের বিয়ে হয় নি।...ও কথা এখন থাক—তোমার মহীদা তোমার জন্যে বসে আছে।"

তিন

ঘুম ভেঙে জেগে উঠে নীলেন্দু কয়েক মুহূর্ত কিছুই স্পষ্ট করে অনুভব করতে [illegible] মনে হল সে কলকাতায় নিজের [illegible] বাড়িতে তার তেতলার ঘরে [illegible] উঠল; আবছা লাগছিল চারপাশ [illegible] চোখ খুলে জানালার দিকে তাকাল। না, কলকাতা নয় [illegible] তেতলার ঘরও নয়; সময়টাও মোটেই শেষ রাত বলে [illegible] বড় বড় হাই তুলল নীলেন্দু; চোখ ছলছল [illegible] আলস্যে। কাল সারা রাত ট্রেনে ঘুমটুম প্রায় ছিল [illegible] থাকার কথা নয়। রাত্রের অনিদ্রা, রেলে চাপার [illegible] অস্থিরতা স্বভাবতই শরীরটাকে ভারী, অলস করে [illegible] ওপর মহীদাদের এখানকার কুয়ার জলে দীর্ঘ সময় ধরে স্নান, [illegible]

মোটা চালের ভাত, প্রচুর শাকসবজি এক পেট খেয়ে আলস্য এবং ঘুম যেন সর্বাঙ্গ জড়িয়ে ধরেছিল। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে নীলেন্দু, তা ঘণ্টা তিনেক হবে, একেবারে অসাড়ে।

বিছানায় উঠে বসে নীলেন্দু হাই তুলতে তুলতে একটা সিগারেট ধরাল। শীতের দুপুর অনেক আগেই ফুরিয়ে গেছে, বিকেলও বোধ হয় শেষ হয়ে এল। জানালার বাইরে রোদ নেই, ময়লা আলো, ঘরের মধ্যে ছায়া কালচে হয়ে এসেছে। কান পেতেও নীলেন্দু কোথাও কোনো সাড়া শুনতে পেল না; মহীদা কিংবা দেবীদির গলা নেই, নড়াচড়ার শব্দ নেই। এত নিস্তব্ধতায় কেমন যেন মনে হয়। মনে হয়, মহীদারা এ বাড়িতে নেই, ছিল না, নীলেন্দু এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে কোনো স্বপ্ন দেখেছে।

আরও একটু বসে থেকে নীলেন্দু উঠল। শীত করছে। [illegible] পাচ্ছিল।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল নীলেন্দু। ভেতরের ঢাকা বারান্দা ফাঁকা। রান্নাঘরের দিকের দরজা বাইরে থেকে ছিটকিনি তোলা। [illegible] দরজাও ভেতর থেকে বন্ধ। ডান দিকে মহীদার ঘর। মহীদার [illegible] গা লাগানো ঘরটা দেবীদির। এ বাড়ির তিনটে ঘরের ছক যেন [illegible] খেয়াল মতন তৈরী করা। পূবের দিকের একটা বড় ঘর দু ভাগে ভাগ করলে যেমন হয়—অনেকটা তেমনই। বাইরের বারান্দা থেকে অপেক্ষাকৃত বড় ঘরটা মহীদার, তার গা-লাগানো পেছনের ঘরটা দেবীদির। নীলেন্দুর ঘরের গায়ে গায়ে ভেতর বারান্দার দিক ঘেঁষে স্নানের ঘর। রাত্রের ব্যবহারের জন্য কলঘর। বাড়ির বাইরের দিক থেকে স্নানের জলটল বয়ে আনার জন্যে দরজা আছে, আলো বাতাস ঢোকার অঢেল ব্যবস্থা। স্নান এবং ছোট কলঘরের গায়ে অল্প ফাঁকা জায়গা, তারপর রান্না আর ভাঁড়ার। অর্থাৎ মহীদাদের ঘরের দিকে যতটা জায়গা গিয়েছে, প্রায় ততটা জায়গায় এপাশের এত ব্যবস্থা।

রান্নাঘরের দিকে ছোট কাঠের চৌকিতে জল ছিল খাবার। ছোট কলসী। পাশে মিটসেফের ওপর দু-চারটে খুচরো বাসন। গ্লাস ছিল কাচের। নীলেন্দু নিজেই জল গড়িয়ে খেল। ভীষণ ঠাণ্ডা জল, দাঁত কনকন করে ওঠে।

দেবযানীর ঘরের দিকে এগিয়ে নীলেন্দু ডাকল, "দেবীদি।"

সাড়া দিল দেবযানী, দিয়ে বাইরে এল।

নীলেন্দু বলল, "কি ব্যাপার! তোমাদের কোনো সাড়া শব্দ নেই?"

তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে দেবযানী বলল, "খুব ঘুমোলে!"

অলস, ভারী গলায় নীলেন্দু বলল, "সাংঘাতিক। রাত্রে আর ঘুমোতে হবে না।...মহীদা কোথায়?"

"ঘরেই ছিল। একজন দেখা করতে এসেছিল তার সঙ্গে কথা বলতে বাইরে গিয়েছে। আসবে এখুনি।"

ভেতর বারান্দার বন্ধ দরজার দিকে তাকাল নীলেন্দু। তাকে একবার বাইরে যেতে হবে। বলল, "বিকেলে তোমাদের চা খাওয়া হয় না?"

দেবযানী যেন কৌতুকের মুখ করল। "কেন?"

"কি জানি, তোমাদের ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে—ওটাই বোধ হয় বাদ দিয়েছ," নীলেন্দু হাসল। "আত্মসংযম করছ হয়ত।"

দেবযানী বলল, "এখনও অতটা পারি নি। তুমি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছ দেখে চা বসাই নি। এবার বসাব।"

নীলেন্দু ইশারায় চা বসাতে বলে বারান্দার দরজার দিকে চলে গেল।

রান্নাঘরের দরজা খুলে দেবযানী স্টোভ ধরাতে বসল।

হাত মুখ ধুয়ে কাপড় জামা বদলে নীলেন্দু আবার যখন রান্নাঘরের

চৌকাটের সামনে এসে দাঁড়াল তখন স্টোভ নিবে গিয়েছে। দেবযানী চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে বসেছিল। নীলেন্দুকে দেখে চা ঢালতে লাগল।

"মহীদা ফিরেছে ?"

"কই দেখছি না তো ?"

"কোথায় গেল ?"

"কথা বলছে বোধ হয়।"

"সেই তখন থেকে ?...দাও, আমায় দাও" "নীলেন্দু হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিল। বসবার জায়গা খুঁজলচারপাশ তাকিয়ে। টেবিলের দিক থেকে চেয়ার টেনে আনার ইচ্ছে তার হচ্ছিল না। কাছাকাছি কিছু নেই। রান্নাঘরের মধ্যে উঁচু মতন একটা চৌকি ছিল ছোট। হাত বাড়িয়ে সেটা চাইল। দেবযানী নিজের চা ঢালতে লাগল।

চৌকিতে বসে নীলেন্দু বলল, "তুমি আমায় অবাক করে দিয়েছ। যতই দেখছি ততই যেন বোকা হয়ে যাচ্ছি।"

"তোমরা অল্পতেই অবাক হও।"

"আমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি, তোমায় এই ভাবে দেখব," নীলেন্দু হাসিমুখে অথচ সামান্য উচ্ছ্বাসের গলায় বলল, "এ-রকম একটা দৃশ্য ভাবাই যায় না। চারপাশে শীতের সারা বিকেল আলো নেই, ঝাপসা অন্ধকার কালচে হয়ে এসেছে, জাফরি দেওয়া বারান্দার এক অন্ধকার কোণে রান্নাঘরে তুমি বসে আছ। আর চৌকাটের পাশে আমি। কোথাও কোনো মানুষজন নেই, একেবারে চুপচাপ। ব্যাপারটা কেমন বাংলা উপন্যাস বলে মনে হচ্ছে।"

দেবযানী হাসল, বলল, "তুমি না একসময়ে কবিতা লিখতে !"

"কোথায় আর লিখতুম ! চেষ্টা করেছিলাম কিছুদিন। হল না।...আমার সেই কাব্যচর্চার সঙ্গে আজকের এই ঝাপসা দৃশ্যের কোনো যোগাযোগ নেই, দেবীদি। বরং বলতে পার, যদি কখনও নিজের অজান্তে এ-রকম কিছু মনে এসেও থাকে আমি নিশ্চয়

মহীদাকে বাদ দিয়ে ভেবেছি।"

দেবযানী তাকাল। নীলেন্দু হাসছে। তার গলার স্বরে পরিহাস। বারান্দা বেশ কালো হয়ে এসেছে। অন্ধকার হয়ে এল। হাত কয়েক তফাত থাকলে দেবযানী নীলেন্দুর মুখ স্পষ্ট করে দেখতে পেত না।

চা খেতে খেতে দেবযানী বলল, "তোমার মহীদাকে তুমি বাদ দিয়ে ভেবেছ, এ আমি বিশ্বাস করি না।"

নীলেন্দু পরিহাস করেই বলল, "কেন বিশ্বাস করো না। প্রেমে আর যুদ্ধে সবই সম্ভব।"

দেবযানী হেসে ফেলে বলল, "তোমার প্রেম আমার পক্ষে সহ্য করা মুশকিল।"

"ঠিক বলেছ দেবীদি, সহ্যশীলা প্রেমিকার বড় অভাব। দুর্লভও বলতে পার।"

"কেন, তোমার সেই বিজয়া—না কে যেন?" ঠাট্টা করে দেবযানী জিজ্ঞেস করল।

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নীলেন্দু বলল, "আমার দুর্ভাগ্য দেবীদি, সেই বিজয়া এখন দিল্লি-নিবাসী। গত জুন-জুলাই মাসে—শ্রাবণট্রাবণ হবে বোধ হয়, বিজয়া যে ভদ্রলোকের করকমল গ্রহণ করল তিনি ভারত সরকারের খাজাঞ্চিখানার বড় পেয়াদা। শুনেছি, লণ্ডনের কোনও অর্থশাস্ত্রের তকমা আছে ভদ্রলোকের। বিজয়ার বাবা, বিজয়া নিজেও সাদরে এঁকে গ্রহণ করেছেন। দেখো দেবীদি, মেয়েরা হিসেবনিকেশেই বলো আর ফাটকা বাজারে কোন শেয়ার ধরবে না ছাড়বে—এ বিষয়ে বেশ পটু। দু এক জায়গায় অবশ্য গোলমাল হয়ে যায়। যেমন তুমি! তুমি যা করেছ সেটা মেয়েদের সাধারণ ধর্ম নয়, এমন বোকামি চট করে কেউ করে না।"

দেবযানী হাসছিল। নীলেন্দু এই রকমই। তার মন খুশী

থাকলে কথা বলার ধরনটাই পালটে যায়, রসরসিকতার অভাব ঘটে না। কেন যেন, দেবযানী নিজেকে অনেকটা হালকা অনুভব করল। বোধ হয় সারাদিনের মধ্যে এই প্রথম কিছুটা স্বস্তি পাবার মতন লাগল।

মহীতোষ আসছে। তার গলা শোনা যাচ্ছিল।

নীলেন্দু বলল, "দেবীদি, তোমাদের এখানে কাছাকাছি কোনো দোকানপত্তর বোধ হয় নেই?"

মাথা নাড়ল দেবযানী, বলল, "রেলফটকের কাছে দিনের দিকে একটা ছোট্ট মুদির দোকান বসে।"

"মুদিতে হবে না। স্টেশনের দিকে যেতে হবে, আমার সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছে।" বলে নীলেন্দু তার প্যাকেটের শেষ সিগারেটটা ধরিয়ে নিল।

মহীতোষ এসে পড়েছিল।

নীলেন্দু বলল, "কোথায় গিয়েছিলে?"

"কোথাও নয়, কাছেই; কথা বলছিলাম একজনের সঙ্গে," মহীতোষ বলল। "তুই একেবারে সেজেগুজে বসে আছিস?"

"স্টেশনের দিকে যাব একবার, সিগারেট কিনে আনতে হবে, সেই সঙ্গে বেড়ানোও হয়ে যাবে।"

"তা হলে বেরিয়ে পড়। খুব শীত পড়বে আজ। বাইরে যে-রকম হাওয়া...।"

দেবযানী কেরোসিনের স্টোভ জ্বেলে মহীতোষের চা গরম করে দিচ্ছিল। নীলেন্দু লক্ষ করল। এসব আগে কোনোদিন ভাবা যায় নি: কত তুচ্ছ ব্যাপারে আগে দেবীদির প্রবল আপত্তি উঠত, ফুটোনো চায়ের রাসায়নিক পরিবর্তন যে মানবশরীরে কত ক্ষতিকর মহীদা তার সম্পর্কে লম্বা বক্তৃতা দিত। এখন কোনো পক্ষের আপত্তি নেই, নীলেন্দু লক্ষ করেও কিছু বলল না।

মহীতোষের চা পেয়ালায় ঢেলে দেবযানী দুধ চিনি মেশাল।

বাস্তবিকপক্ষে এখন রান্নাঘরের মধ্যেটা অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। দেবযানীকে দেখা যায়, কিন্তু চোখমুখ চেনা যায় না, অন্ধকার তার মুখের গড়ন এবং রেখা একেবারেই অস্পষ্ট করে ফেলেছে।

হাত বাড়িয়ে চা নিল মহীতোষ।

নীলেন্দু বলল, "মহীদা, আমি দেবীদিকে নিয়ে একটু ঘুরে আসছি।"

মহীতোষ কিছু বলার আগেই দেবযানী বলল, "আমায় আবার কোথায় টেনে নিয়ে যাবে?"

"স্টেশন। চলো, বেড়িয়ে আসবে।"

"আমায় কেন অযথা টানছ?"

"তোমার এখন কোন্ কাজ? সন্ধ্যে জ্বালাবে না শাঁখ বাজাবে?" ঠাট্টা করে বলল নীলেন্দু।

দেবযানী পিঁড়ি থেকে উঠে দাঁড়াল, বলল, "সন্ধ্যে না জ্বালালেও বাতি জ্বালাতে হবে, অন্ধকার হয়ে গেছে।"

"বাতি জ্বালিয়ে নাও, তারপর যাব।"

মহীতোষ দেবযানীর দিকে তাকাল, বলল, "যাও, ঘুরে এসো।"

শীতের হাওয়া এমন করে [illegible] নীলেন্দু বোঝে নি। ঝড় নয়, কিন্তু প্রায় ঝড়ের মতনই শনশন করে হাওয়া দিচ্ছিল শীতের। শুকনো, কনকনে হাওয়া। আজ কি তিথি বোঝা মুশকিল, আকাশে কোথাও চাঁদ দেখা যাচ্ছিল না, অজস্র তারা আকাশের কোণে কোণে জড় করা। সন্ধ্যাতারা জ্বলজ্বল করছিল। ছেলেবেলায় নীলেন্দুর বড়মামা তাকে সপ্তর্ষি, কালপুরুষ চিনতে শিখিয়েছিলেন, সে সব আর মনে নেই নীলেন্দুর। এখন অবশ্য নক্ষত্র অনুসন্ধানেও কোনো উৎসাহ ছিল না তার। শীতের বাতাস এবং চারপাশের কনকনে ঠাণ্ডা সহ্য করতেই শরীরের সমস্ত উদ্যম ব্যয় হয়ে যাচ্ছিল।

পাশে দেবযানী। দেবযানী অতটা কাতর নয়। মোটামুটি

স্বাভাবিকভাবেই পথ হাঁটছিল। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় টর্চ নিয়েছে দেবযানী, হাতে টর্চ।

নীলেন্দু বলল, "দেবীদি, এই যদি তোমাদের সন্ধ্যেবেলার ঠাণ্ডা হয়, রাত্রে নিশ্চয় বরফ পড়বে।"

দেবযানী হেসে বলল, "তোমার ঘরে কাঠকয়লার আগুন দিয়ে দেব।"

"চিতা সাজিয়ে আমায় ঢুকিয়ে দিলেও আপত্তি নেই, নীলেন্দু হাসল।

দেবযানী বলল, "এরপর তো আরও শীত পড়বে।"

"বলেছিলে তখন···। কি জানি তখন কী হবে!"

মাঠ ছাড়িয়ে রাস্তায় উঠল নীলেন্দুরা ; দু জনেই চুপচাপ। রাস্তার পাশে ঢালু মাঠ, কোথাও কোথাও গরিব গেরস্থির ছোট ছোট ক্ষেত, সবজি ফলানো হয়েছে। কিছুই এখন চোখে পড়ার উপায় নেই, কুয়াশার পুঞ্জ যেন অন্ধকারের সঙ্গে মেশানো।

নীলেন্দুই শেষে কথা বলল। "দেবীদি, তোমার সঙ্গে আমার কতকগুলো কথা আছে। যদি বলো এইবেলা সেরে নিতে পারি।"

দেবযানী দু মুহূর্ত নীরব থাকল, তারপর লঘু গলায় বলল, "তোমার কথা কি এত অল্পে সারা হবে ?"

"হবার কথা নয়," নীলেন্দু মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "তবু শুরু করা যাক্ ; গোড়ার কথাটা হয়ে যাক্।"

"বলো।"

নীলেন্দু গলার করকরে মাফলারটা আরও ঘন করে জড়িয়ে নিল। বলল, "তুমি কলকাতা থেকে পালিয়ে আসার আগে আমায় ঘুণাক্ষরেও কিছু জানালে না কেন ? ভয়ে ?"

দেবযানী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। হাঁটতে লাগল। রাস্তার দিকে টর্চের আলো ফেলল একবার, নিবিয়ে দিল। শেষে বলল, "তুমি যাকে পালিয়ে আসা বলছ আমি তাকে পালানো বলি না।

আমরা চলে এসেছি। আমাদের কি নিজের খুশিমতন চলে আসার অধিকার নেই? তুমি আমায় নাবালিকা ভাবছ নাকি?"

নীলেন্দু বলল, "না, তোমায় আমি সেসব কিছু ভাবি নি। তুমি সাবালিকা; তোমার বয়েস বোধ হয় বছর বত্রিশ হল; আমার মাথায় মাথায় ছুটছ। খুকিপনার বয়েস তোমার নেই, যে অবস্থা ঘটলে মেয়েরা সবকিছু ছেড়েছুড়ে পুরুষমানুষের হাত ধরে বাড়ি ছাড়ে সে অবস্থাও তোমার হয় নি। তুমি বয়সের দোষে বা টানে যে ঘর ছাড় নি তা আমি জানি, দেবীদি। তুমি মহীদাকে তোমার আঁচলের আড়ালে ঢেকে রাখার জন্যে পালিয়ে এসেছ।"

দেবযানী বিরক্ত হল না, রাগ করল না, বলল, "তোমার মহীদা কি আমার আঁচলের তলায় থাকার মানুষ! যদি তেমন স্বভাবের মানুষ হত ও—তবে অনেক আগেই আমি ওকে ঢেকে নিতুম।"

নীলেন্দু ঘাড় ফিরিয়ে দেবযানীর দিকে তাকাল। বলল, "মানুষ যখন হেরে যায় তখন নিজের লজ্জা বাঁচাবার জন্যে সে সুবিধেমতন কৈফিয়ত খাড়া করে। মহীদা যে তোমার প্রেমের টানে, তোমার খাতিরে পালিয়ে এসেছে—এই কথাটা বোধ হয় মহীদা আজ মনে মনে স্বীকার করবে। দোষ নিও না দেবীদি, আমি তোমার ভালবাসাকে তুচ্ছ করতে চাইছি না, ছোট করতেও নয়, আমি তোমার সব জানি। কিন্তু, একথা কি তোমার একবারও মনে হয় না, তোমার ভালবাসার দিকে মন একটু বেশীরকম ঝুঁকে না পড়লে মহীদা এরকম করত না?"

দেবযানী বোধ হয় খুশী হল না। বলল, "একটা লোক যদি মনে করে তোমাদের মধ্যে সে থাকতে পারছে না, তার কি তোমাদের ছেড়ে আসার অধিকার নেই?"

একটু চুপ করে থেকে নীলেন্দু বলল, "যদি নীতির দিক থেকে ধরো তা হলে আমরা বলব, নেই। এখানে আমরা বলতে আমাদের সমষ্টিগত নীতি বুঝবে। ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য আমি অধিকার

মানি। না মানলে, বন্ধুর মতন তোমাদের কাছে আসতাম না।"

অনেকক্ষণ আর কোনো কথা হল না। পাশাপাশি দুজনে হাঁটতে লাগল। নীলেন্দুর পায়ে শব্দ হচ্ছিল না, ক্যানভাসের মোটা বুট রাস্তার শব্দ ঢেকে দিচ্ছিল। দেবযানীর পায়ে খুব মৃদু শব্দ হচ্ছিল। দু'জনের দীর্ঘতায় কিছুটা তফাত রয়েছে, ছায়ার মতন পাশাপাশি চলে যাচ্ছে তারা। দেবযানী সাধারণ মেয়ের তুলনায় সামান্য দীর্ঘ, গায়ের শাল মাথায় তুলে জড়িয়েছে—ফলে নীলেন্দুর মাথা ছুঁয়ে ফেলার মতন দেখাচ্ছিল। সামান্য দূরে রেলফটক। একটা লাল বাতি জ্বলছিল জ্বলজ্বল করে।

নীলেন্দুই আবার বলল, "তুমি যে আমাদের বিশ্বাস করো নি, পছন্দ করো নি—এটা তো নতুন কথা নয়, দেবীদি। সকলেই সেটা জানে। তোমার অপছন্দ অবিশ্বাস সত্ত্বেও মহীদা আমাদের মধ্যে ছিল। যতদিন ছিল ততদিন তোমায় নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই নি। যখন আর মহীদা থাকল না—তখন বেশ বুঝতে পারলাম, তুমি তাকে আস্তে আস্তে দুর্বল করে দিয়েছে। এই দুর্বলতা মুখ ফুটে স্বীকার করা লজ্জার। কিংবা স্বীকার করলেও সেটা মুখের কথা হবে—তার বেশী কিছু নয়। মোদ্দা কথাটা এই, মহীদা তোমার টানে আমাদের ছেড়েছে; তুমি তোমার ভালবাসার মানুষটিকে নিরাপদে এবং নির্ঝঞ্ঝাট রাখার জন্যে আমাদের সংস্রব ছেড়ে পালিয়ে এসেছ। ভয়ে। এটা পালানো ছাড়া আর কি।"

দেবযানী হাতের টর্চটা জ্বেলে ফেলল। বোধ হয় অস্থিরতার জন্যে রাস্তায় আলো ফেলল, পাশের মাঠে ফেলল, শূন্যের চারিদিকে ঘোরাল, তারপর নিবিয়ে দিল।

"যদি তাই হয়, তাতে ক্ষতি কি?" দেবযানী এবার শক্ত গলায় বলল।

"ক্ষতি কি, তা তোমায় চট্ করে বোঝাতে পারব না। আগেও অনেকবার এ নিয়ে তোমার-আমার মধ্যে বচসা হয়েছে। ও কথাটা

এখন থাক্ ;। আপাতত ধরে নাও, যেজন্যে তুমি পালিয়ে এসেছ, যদি সেটা না হয়।"

দেবযানী যেন ভাল বুঝল না, নীলেন্দুর দিকে তাকাল। "মানে ?"

"মানে—মহীদাকে তুমি এখানে টেনে এনে যতটা নিরাপদ করতে চেয়েছ ততটা নিরাপদ সে নয়।"

"তুমি যে আমায় এই কথাটা বোঝাতে এসেছ, এ আমি আগেই সন্দেহ করেছি।"

কী যেন ভাবল নীলেন্দু, তারপর আচমকা বলল, 'ঠিকই করেছ···। তুমি কি আমার ব্যাগের মধ্যে হাত দিয়েছিলে ?"

"না। কেন ?" দেবযানী অবাক হয়ে গেল।

"আমার প্যান্টের, যেটা গাড়িতে পরে এসেছিলাম, তার ভেতর দিকের চোরা পকেটে হাত দিয়েছ ?"

"না", দেবযানী কেমন ভয়ের গলায় বলল।

নীলেন্দু বলল, "যদি দিয়ে থাকো তবে আগেই জেনেছ। যদি না দিয়ে থাকো তবে তোমার কাছে বলতে আপত্তি নেই, বিশ্রী একটা জিনিস আমি কলকাতা থেকে বয়ে এনেছি। সেটা তোমার মহীতোষকে মোটেই নিরাপদে রাখার উপযুক্ত নয়।"

দেবযানী ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে দেখবার চেষ্টা করল নীলেন্দুকে। ভয় এবং বিমূঢ়তা তার দৃষ্টিকে যতটা আচ্ছন্ন করেছে প্রায় ততটাই অস্পষ্ট করেছে এই অন্ধকার নীলেন্দুর চোখ-মুখ। কিছু বোঝা যাচ্ছিল না, নীলেন্দু হিংস্র চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে—নাকি এই অবস্থায় দেবযানীর মুখ কতটা ভয়ার্ত, রক্তশূন্য হয়েছে দেখবার চেষ্টা করছে।

নিজের শিউরে ওঠার ভাবটা অনুভব করতে পারল দেবযানী। বুক কাঁপছে কি কাঁপছে না খেয়াল হল না। নীলেন্দুর নীচের ঠোঁট পুরু, ওপর এবং নীচের ঠোঁট খোলা রয়েছে, সামনের দাঁতের সাদা অংশ সামান্য যেন দেখা যাচ্ছিল। দেবযানীর মনে হল, এই ভয় এই

আতঙ্ক তাকে সারাদিন অস্থির করে রেখেছিল, স্বস্তি দিচ্ছিল না যদিও তবু শেষ পর্যন্ত সে নীলেন্দুকে বিশ্বাস করতে চাইছিল। মহীতোষ তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে বলেছিল : 'তুমি ভাবছ কেন, নীলু নিজের ইচ্ছেয় এসেছে, নিজের মর্জিতে।' কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করে নেবার মতন মনের অবস্থা দেবযানীর নয়, তবু সারাদিন নানা-রকম ভাবতে ভাবতে, নীলেন্দুকে লক্ষ করে তার ধারণা হচ্ছিল, হতেও পারে—কোনো দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নিয়ে নীলেন্দু আসে নি।

এখন দেবযানীর আর কোনো সন্দেহ রইল না, নীলেন্দু পাকা-পাকি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছে। তার প্রবল ভয় হচ্ছিল।

নীলেন্দু দেবযানীর আতঙ্ক অনুভব করতে করতে বলল, "তুমি খুব ভয় পেয়ে গেছ দেবীদি।"

দেবযানী কিছু বলল না। আর সহসা অনুভব করল, তার বুক ধকধক করছে, দ্রুত ঘা পড়ছে হৃদপিণ্ডে। কেমন এক ধরনের রাগ, আক্রোশ, ঘৃণা তাকে জ্ঞানহীন করে তুলছে।

"তুমি তোমার মহীদাকে মিথ্যে কথা বলেছ—!" রুক্ষ কর্কশ গলায় দেবযানী বলল।

নীলেন্দু বেশ শান্ত ভাবে বলল, "তা বলে থাকতে পারি।" বলার পর নীলেন্দুর নিজেরই মনে হল, এ একেবারে থিয়েটারের ব্যাপার হচ্ছে। বড় নাটকীয়। এবং ছেলেমানুষী। হঠাৎ সে হেসে উঠল। হাসিটা তেমন জোর নয়, কিন্তু সহজ।

দেবযানীর পিঠে হাত রাখল নীলেন্দু, দু-চারবার আলতো করে চাপ দিল। তারপর পিঠের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে দেবযানীর হাত ধরে ফেলল আচমকা।

দেবযানীর হাত ঠাণ্ডা কনকন করছিল। নীলেন্দুরও হাত গরম নয়।

নীলেন্দু বলল, "আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম, দেবীদি।

দেখছিলাম, আমার সম্পর্কে তোমার মনোভাবের কোনো অদলবদল হল কিনা। পুরো একটা বেলা তো কাটল।...যাকৃগে, তোমায় সত্যি কথাটা বলি। আমি তোমার মন দেখছিলাম। আমার কাছে ভয় পাবার মতন কিছু নেই। তুমি আমার সমস্ত কিছু তন্নতন্ন করে খুঁজলেও কিছু পাবে না।"

দেবযানী কথা বলল না, বড় নাগরদোলার চূড়ায় উঠে নীচে নেমে আসার মতন তার উত্তেজনা ক্রমশ কমে আসছিল।

নীলেন্দু দেবযানীর দু হাত আরও চেপে ধরে বলল, "দেবীদি, তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পারছ না?"

দেবযানী নীলেন্দুর হাতের চাপ অনুভব করতে করতে বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল।

## চার

বাড়ি ফিরে দেবযানী দেখল, মহীতোষ নিজের ঘরে বসে কাগজ-পত্র নিয়ে কাজ করছে। ঘরের জানলা বন্ধ। এত ঠাণ্ডার মধ্যে কোনো কিছু খুলে রাখার উপায় নেই। শীতের এই সময়টায় মশাও হয় বেশ। ঘরের বাতাসে মশামারা সেই ধূপের গন্ধও রয়েছে। কাঠের ছোট টেবিলের সামনে ঝুঁকে বসে কেরাসিনের টেবিল-বাতির আলোয় মহীতোষ মন দিয়ে কাজ করছিল।

দেবযানী মহীতোষের পিঠের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। কিছু বলবে মহীতোষ, কোনো রকম সাড়া দেবে যেন এই অপেক্ষায় দেবযানী দাঁড়িয়ে থাকল।

কিছু বলছিল না মহীতোষ, হাতের কাজ শেষ করে নিচ্ছিল।

দেবযানী কি যেন বলতে গিয়েও বলল না। সামান্য সরে গিয়ে উঁচু টুলটার ওপর বসল। বসে অন্যমনস্কভাবে ঘরের চারিদিকে তাকাতে লাগল।

মহীতোষের এই ঘরে নতুন করে দেখার কিছু নেই, অন্তত দেবযানী লক্ষ করতে পারে এমন কিছুই নয়। সাধারণ ছোট তক্তপোশ একপাশে, বিছানা পাতা, মোটা একটা সুজনি দিয়ে ঢাকা; সস্তা আলনা, দেওয়াল তাকের ওপর দু-চারটে খুচরো জিনিস, ছোট আয়না চিরুনি, এক শিশি মলম, শুকনো হরীতকী কয়েকটা, দু-চারটে বই, কিছু পুরোনো কাগজপত্র। একটা বাক্স একপাশে দেওয়ালের কোণ ঘেঁষে রাখা।

দেবযানী হঠাৎ যেন কেমন বিরক্ত বোধ করল। কেন করল সে জানে না। হয়ত এই বাড়াবাড়ি ধরনের অনাড়ম্বর গৃহসজ্জাই তাকে বিরক্ত করল; বা মহীতোষ কোনো কথাবার্তা বলছে না বলেই সে বিরক্ত হচ্ছিল।

দেবযানী নিজেই কথা বলল। "তোমার ঘরে আগুন লাগবে?"

মহীতোষ মুখ না তুলেই বলল, "কটা বাজল বলো তো?"

"সাড়ে সাতটাত হবে," দেবযানী মোটামুটি অনুমান করে বলল। বাড়ি ফেরার সময়—কলকাতা থেকে আসা এক্সপ্রেস গাড়িটা চলে যেতে দেখেছে সে; ট্রেনের সময় হিসেব করে দেখলে এখন ওই রকম সোয়া সাত কি সাড়ে সাত হবে।

মহীতোষ বলল, "নীলুকে দাও। এখানকার এই ঠাণ্ডা ওকে জমিয়ে ফেলবে।"

দেবযানী অসন্তুষ্ট গলায় বলল, "নীলুর জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। বাইরে খুব ঠাণ্ডা। ঘরের ভেতরও কনকন করছে। আগুন লাগবে কিনা বলো?"

মহীতোষ ঘাড় উঠিয়ে দেবযানীর দিকে তাকাল। টুলের ওপর কাছাকাছি দেবযানী বসে। তবু এই টেবিল-বাতির মিটমিটে আলোর অত উজ্জ্বলতা নেই যে দেবযানীর মুখ স্পষ্ট করে দেখা যাবে। লক্ষ করতে করতে মহীতোষ বলল, "এখন লাগবে না; পরে যদি দরকার হয় বলব।"

দেবযানী কথা বলল না। আজ কিছুদিন ধরে বাড়াবাড়ি ধরনের ঠাণ্ডা পড়ে যাওয়ায় রাত্রের দিকটায় মাটির মালসায় কাঠকয়লার আগুন এনে ঘরে রাখতে হচ্ছে প্রায়ই। দেবযানী এসব জানত না; তার জানার কথাও নয়; লালু শিখিয়ে দিয়েছে, জামকাঠের ডালপালা পুড়িয়ে কাঠকয়লাও করে দিয়েছে এক ঝুড়ি।

মহীতোষ বলল, "নীলু কোথায়?"

"ঘরে।"

"তোমরা স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলে, না আর কোথাও বেড়ালে?"

স্টেশন থেকে ফিরে এসেছি।"

"ভালই করেছ," মহীতোষ আবার টেবিলের ওপর মাথা নোয়ালো। "এখানে ঠাণ্ডায় বেশী ঘোরাঘুরি নীলুর সহ্য হবে না; ও তো আবার প্লুরিসিতে ভুগেছে।"

দেবযানী চুপ করে থাকল। নীলেন্দুর প্লুরিসিতে ভোগার ইতিহাস ওর অজানা নয়। বছর দুয়েক আগে বর্ষার শেষ দিকে, পুজোর পর পর নীলেন্দু অসুখটা বাধিয়ে তুলেছিল, ভুগেছিল বেশ কিছুদিন, শরীর ভেঙে গিয়েছিল, মাস দুই ঘরের বিছানায় পড়েছিল। সেই ভাঙা শরীর সারাতে কম সময় যায় নি। এখন নীলেন্দুকে দেখলে তার অসুখের কথা মনে পড়ে না। দেবযানীরও মনে হয় নি। মহীতোষের কথায় মনে পড়ল।

"ওকে বরং আগুন দিয়ে এসো," মহীতোষ বলল, "সাবধানে থাকতে বলো, বাহাদুরি করলে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।...কী করছে নীলু?"

"ঘরে।"

"কিছু দিয়েছ ওকে? গরম কিছু দাও খেতে।"

দেবযানী বিরক্ত হয়ে বলল, "তুমি আমায় মেয়েলী ব্যাপার শিখিও না। তোমার নীলুকে যা দেবার আমি দেব। তোমার

নিজের আগুন লাগবে কিনা বলো ? চা খাবে, না খাবে না ?"

"আগুন লাগবে না। নীলুর জন্যে চা করলে একটু দিতে পার।"

দেবযানী আর কিছু বলল না। সামান্যক্ষণ বসে থাকল। বসে বসে মহীতোষকে দেখতে লাগল। মহীতোষ কোনোকালেই তেমন সুপুরুষ ছিল না যে চোখ তুলে দেখলে আর পলক পড়বে না। তার গায়ের রঙ উজ্জ্বল হলেও তেমন কিছু গৌরকান্তি নয়, মাঝারী রকমের ফরসা বড় জোর। মাথায় সাধারণত লম্বা, পুরুষমানুষের পক্ষে যতটা না হলেই নয়, দেবযানীর চেয়ে কয়েক আঙুল মাত্র দীর্ঘ মাথায়। প্রচণ্ড স্বাস্থ্য নয় মহীতোষের, বরং ছিপছিপে গড়ন। মুখ খানিকটা তেকোনা ধরনের—অর্থাৎ গালের চোয়াল পাতলা, থুতনি সরু; মোটামুটি লম্বাটে কপালের তলায় গাল এবং থুতনির এই গড়ন খানিকটা তেকোনা দেখাবারই কথা। মহীতোষের ঘন, জোড়া ভুরুর তলায় মোলায়েম শান্ত চোখ তার স্বভাবের নরম দিকটা যেন প্রকাশ করে ফেলে। এই চোখ নরম, শান্ত, কিন্তু কেমন যেন দ্বিধাপূর্ণ। কখনো কখনো উদাসীন মনে হয়। আবার এই চোখে দেবযানী একসময়ে যে উত্তেজনা ও আবেগ দেখেছে তাও যেন ভুলে যাবার নয়। মহীতোষের শক্ত সরু নাক, তার ঝকঝকে দাঁত, পাতলা বাঁকানো ঠোঁট—মানুষটার কোনো শক্তি এবং জেদের আভাসও যেন দেয়।

টুল থেকে উঠে পড়ল দেবযানী। হাতে কাজ রয়েছে।

নিজের ঘরে এসে দেবযানী লণ্ঠনের আলো বাড়িয়ে নিল। তার ঘরের সঙ্গে মহীতোষের ঘরের তেমন কোনো প্রভেদ নেই। আকারের দিক থেকে সামান্য ইতরবিশেষ হলেও সেই বড় বড় জানলা গোটা দুই, মাথার ওপর চটের সিলিং, দেওয়ালের কোথাও কোথাও পাতলা ছোপ ধরেছে। আসবাবপত্র হয়ত এ ঘরে সামান্য বেশী। খাটটা সামান্য সুদৃশ্য, ছোট মাপের একটা আলমারি আছে কাঠের, দেওয়ালের একদিকে বড় আয়না ঝোলানো, তার তলায় সরু ব্র্যাকেট ;

গদিমোড়া একটা ইজিচেয়ারও রয়েছে কোণ ঘেঁষে। আরও কিছু খুচরো, ছোটখাট আসবাবপত্র। বাড়িটা কেনার সময় এই আসবাব-পত্রও কিনে নিতে হয়েছিল। প্রয়োজন তো ছিলই। আর কিছু কিছু আশিস যোগাড় করে এনেছে।

গায়ের শাল খুলে রেখে দেবযানী শাড়িটা পালটে নিল। এক সময়ে তার নানা ধরনের শখের মধ্যে ছিল শাড়ির শখ। সিল্ক সে পছন্দ করত বরাবর, ভালবাসত, বিশেষ করে একরঙা বা হালকা করে ছাপা সিল্কের শাড়ি। তাঁতের মধ্যে ধনেখালি তার ভাল লাগত।

এখনও কলকাতার বাড়িতে দেবযানীর ঘরের আলমারি খুললে একরাশ আলমারি ভরতি শাড়ি পাওয়া যাবে। দু-এক বছরের জমানো নয়, আরও বেশীদিনের। কত রকম জায়গা থেকে কিনেছিল, কোনোটা কলেজ স্ট্রীট থেকে, কোনোটা মার্কেট থেকে, কোনোটা বা গড়িয়াহাটা থেকে। সেসব আজও আছে। থাকা উচিত। অবশ্য দেবযানী জানে না, তার ঘর আজও ফাঁকা পড়ে আছে কিনা—কিংবা অন্য কারও দখলে চলে গেছে। দখল করলে ছোটবউদিই করতে পারে। ছোটবউদি বরাবরই, বিয়ের পর এ বাড়িতে এসে পর্যন্ত তার ঘরের দিকে চোখ দিত। দিত—কেননা ছোড়দার বিয়ের পর তেতলার যেদিকটা তাকে ছেড়ে দেওয়া হল—সেদিকে পুব-দক্ষিণ বন্ধ; উত্তর দিকে একটা বার্লির কারখানা। পশ্চিম দিকে চোখ মেলে থাকা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। আর পশ্চিমে সেই খাল, দু-চারটে গাছ, একটানা বস্তি ছাড়া কিছু নেই। দেবযানীর ঘরটা পেলে ছোটবউদি সকালের দিকে পুবের রোদ পাবে, বারান্দায় বসলে অন্তত বার্লি কারখানার দিকে না তাকিয়েও থাকা যাবে। তা ছাড়া, কোনো কোনো মানুষ, নতুন হলেও, কোথাও আসা মাত্র তার দাবিটা জানাতে লজ্জা পায় না। ছোটবউদি সেই রকম। শ্বশুর-বাড়িতে এসেই জানিয়ে রেখেছে দেবযানীর বিয়ে হয়ে গেলে ঘরটা তারই প্রাপ্য।

শাড়ি বদলে দেবযানী বাড়িতে পরার ছোট, করকরে শালটা গায়ে জড়িয়ে নিল। শাড়িটা সাধারণ। সাদা খোলের। পাড়ও মামুলি। কলকাতার বাড়ি থেকে চলে আসার সময় দেবযানী কিছুই নেয় নি, তার স্যুটকেসে গয়না ছাড়া দু-চারখানা শাড়ি জামা ছিল যা নিতান্ত সব সময়ে প্রয়োজন হবে বলে সে নিয়েছিল। আজকাল যা পরেটরে তার কোনোটাই সেই শাড়িটাড়ি নয়। বাড়ি থেকে কিছু আনতে দেবযানীর ইচ্ছে হয় নি, সুযোগও ছিল না। গয়না আর নেহাত যা দরকারে লাগবে, দু-চারটে শাড়ি জামা ছাড়া বাবার একটা ছোট ফটো এনেছিল ফ্রেমে বাঁধানো। ছবিটা তার ঘরের দেওয়ালে সে ঝুলিয়ে রেখেছে।

অন্যমনস্কভাবে দেবযানী বাইরে এল। ভেতর-বারান্দা অন্ধকার। অন্ধকার দিয়েই কলঘরের দিকে চলে গেল। যাবার সময় দেখল, রান্নাঘরের দরজা আধাআধি খোলা! লাটু উনুন ধরিয়ে রেখে গেছে যাবার সময়।

হাতে পায়ে জল দিয়ে মুখের ঠাণ্ডা ভাবটা মুছতে মুছতে দেবযানী রান্নাঘরে এল। কুয়ার তোলা জল হাতে পায়ে দেবার পর শীত ধরে গেছে। সামান্য কাঁপুনি লাগছিল। ছোট লণ্ঠন জ্বেলে নিল দেবযানী। লাটু তোলা উনুন ধরিয়ে কাঠকয়লা ছড়িয়ে রেখেছে। কয়লাগুলো প্রায় সবই জ্বলে উঠেছে।

হাত দুটো সামান্য সেঁকে নিল দেবযানী। লাটুর গুণের শেষ নেই। সে যেন জানে কোন কাজটা তার সেরে রাখা দরকার। লাটুকে এই বাড়িতেই রাখতে চেয়েছিল দেবযানী; লাটু রাজী হয় নি, বাড়িতে তার বুড়ো বাপ আর হাবাবোবা এক ভাই। লাটু সাত-সকালে এ বাড়িতে আসে, সন্ধ্যে নাগাদ চলে যায়। বাসন-কোসন মাজা আর ঘরদোর পরিষ্কার ছাড়া বাকি সবটাই লাটুর হাতে, লাটু বাজারঘাট করে, বাগান দেখে, জল তোলে, দেবযানীকে খুঁটিনাটি কাজে সাহায্য করে। সকালে এ-বাড়িতে খায়, রাতে নিজের বাড়িতে!

মালসা টেনে নিয়ে দেবযানী কাঠকয়লার আগুন সাজাল চিমটে দিয়ে, কয়েক টুকরো নতুন কয়লাও দিয়ে দিল।

মালসা দুটো চৌকাটের বাইরে সরিয়ে রেখে দেবযানী চায়ের জল বসালো। একটু পরে দিয়ে আসবে, সামান্য আঁচ উঠে যাক।

নীলেন্দুর জন্যে আজ উনুন ধরানো। রাত্রের দিকে উনুন ধরানোর প্রয়োজন বড় একটা করে না। শীতের দিন, সকালে করা রান্নাবান্না রাত্রে স্টোভ ধরিয়ে গরম করে নিলেই চলে, এমনকি গরম তাওয়ায় সকালের রুটি সামান্য ঘি মাখিয়ে নেড়েচেড়ে নিলেও নরম হয়ে যায়।

হাতের কাছে তরকারির ঝুড়িতে কড়াইশুঁটি ছিল। টাটকা কড়াই। দেবযানী একটা কাচের বাটিতে কড়াইশুঁটি ছাড়িয়ে রাখতে লাগল। নীলেন্দুকে এখন খেতে দেবার মতন কিছু নেই, কড়াইশুঁটি সেদ্ধ বসিয়ে তাতে দু টুকরো আলু আর টমাটো দিয়ে দেবে। খেতে ঘুঘনির মতন, অথচ কতটুকুই বা সময় লাগবে।

তার এই গৃহিণীপনা দেখলে নীলেন্দু হেসে বলবে, দেবীদি, তুমি তো কিছুই বাকি রাখলে না, আদর্শ বঙ্গবধূ।

কোনো সন্দেহ নেই, দেবযানী আজ ছ-সাত মাসে অনেক কিছু শিখেছে। তার মানে এই নয় যে, আগে তার কিছু জানা ছিল না। যে ধরনের পরিবারে জন্মালে—এমন বাঙালী পরিবার আছে কিনা দেবযানীর অবশ্য জানা নেই—মেয়েদের কুটো কাটবারও দরকার হয় না, বা সে শিক্ষা তারা পায় না—দেবযানী তেমন পরিবারে জন্মায় নি। তাদের বড় পরিবারের শিক্ষাদীক্ষা ছিল গৃহস্থ ধরনের। মা যতদিন বেঁচে ছিল, ঠাকুর-চাকরের হাতে সংসার ছেড়ে দেয় নি। ঠাকুর-চাকর ছিল, তাদের মাথার ওপর ছিল মা। প্রত্যেকটি খুঁটি-নাটি নজরে রাখত। নিজের হাতে সকাল বিকেল তদারক করত সব। বড়দার বিয়ের পর বড়বউদিকেও মা সংসারের এই সাধারণ ব্যাপারটার বাইরে থাকতে দেয় নি। হেঁশেলে জুতে দিয়ে বড়

বউদিকে যে মা জব্দ করেছিল তাও নয়। ঘরের বউ-মেয়ে কোনো কিছু জানবে না, শিখবে না, পাঁচভূতের ওপর ছেড়ে দিয়ে বিছানায় পা তুলে শুয়ে থাকবে—মা মোটেই তা বরদাস্ত করত না। অর্থাৎ মার পুরো শিক্ষাটাই ছিল মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে-বউদের যেমন হওয়া উচিত সেই রকম। ঘরের মধ্যে ছন্নছাড়া ভাব দু চোখের বিষ ছিল মার। মেজবউদিকেও মা একই ছাঁচে তৈরী করেছিল। অবশ্য বড়বউদি কিংবা মেজবউদি—কেউই এমন পরিবার থেকে আসে নি যাতে মেয়েলী এই সব শিক্ষা তাদের থাকবার কথা নয়। বউদিরা মার সাংসারিক শিক্ষায় নতুন কিছু দেখে নি, অখুশীও হয় নি। মা মারা গেল মেজদার বিয়ের পরের বছর। তখন ঠিক শীতকাল নয়, কার্তিকের শেষ, একটু একটু ঠাণ্ডা পড়ছে ; মা সকালের বাসি কাপড় ছেড়ে ঠাকুরঘর থেকে ফিরে সবে শ্বেতপাথরের কাপে রাখা চায়ে মুখ দিয়েছে, শরীরটা কেমন আনচান করে উঠল। বার কয়েক কাশল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বাকি চা টুকু খেয়ে, সবজির ঝুড়ি টেনে বসল ; বড়দা মেজদার অফিস, তরকারি কুটে দেবে। বড়বউদি মার পান সেজে আনল। আর সেই সময়, সবে বঁটির গলায় আলু ছুঁইয়েছে, মা কেমন ছটফট করে উঠেই বউদিকে কিছু বলতে গেল, পারল না, মেঝের ওপর টলে পড়ে গেল। মার ভারী শরীর দু হাতে জড়িয়ে বউদি চেঁচাতে লাগল ; বাড়িতে হইচই—ছুটোছুটি, ডাক্তার এল পাড়ার,—হাসপাতালে নিয়ে চলো এখনি। হাসপাতালে বিকেলের দিকে মা মারা গেল। সেরিব্রাল হেমারেজ।

বাবা মারা গিয়েছিল তারও আগ। দেবযানীর বয়েস যখন বছর তেরো। মা মারা গেল—তার একুশ বছর বয়েসে। বাবাকে দেবযানী যত বেশী করে পেয়েছিল, মাকে বোধহয় ততটা নয়। মার স্বভাবে শৃঙ্খলা ছিল বেশী রকম, শাসন ছিল চাপা, বাস্তব বোধ ছিল প্রখর। বাবার স্বভাবে এসব ছিল না বড়, বরং চরিত্রের দিক থেকে বাবা বোধ হয় মার উলটো প্রকৃতির ছিল। সংসারে যারা পুরোপুরি

ডুবে থাকতে পারে না, ভালও বাসে না—বাবার স্বভাব ছিল তাদের মতন। বাবা স্বভাবে এলোমেলো ছিল, অনেক ব্যাপারে উদাসীন, সরলহৃদয় মানুষ। মার সাংসারিক দূরদৃষ্টি, বাস্তব জ্ঞানের পাশে বাবাকে মানাবার কথা নয়। কিন্তু মার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে বাবা নির্ঝঞ্ঝাটে এবং শান্তিতে জীবন কাটিয়ে গিয়েছে। তাদের কলকাতার বাড়ি—সেও মার সম্পত্তি। দাদমশাই-দিদিমার জীবিত সন্তান বলতে মা ছাড়া কেউ ছিল না, কাজেই মা-বাবার যা-কিছু মেয়ে পেয়েছিল। এ ব্যাপারে বাবার যদি বা মনে একটা অস্বস্তির ভাব থেকেও থাকে তা স্পষ্ট বোঝা যেত না। মাঝে মাঝে মা-বাবার হাসি-তামাশার মধ্যে বাবার সঙ্কোচটা বোঝা যেত। কিন্তু তাও এমন কিছু নয় যে মনে করে রাখা যায়।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেবযানী সবচেয়ে ছোট বলে এবং একটি মাত্র মেয়ে বলে বাবার প্রশ্রয় সবচেয়ে বেশী পেয়েছে। মার প্রশ্রয়ও কম নয়। কে জানে, মেয়েকে এতটা আদর-সোহাগ দেবার জন্যেই দেবযানী সংসারের অন্যদের চেয়ে খানিকটা আলাদা রকম হয়ে উঠল কি না!

চায়ের জল গরম হয়ে গিয়েছিল। কেটলি নামিয়ে রাখল দেবযানী। চায়ের জল আগে ফুটিয়ে নিয়ে ভুলই করল সে, আবার হয়ত জল গরম করতে হবে। হাতের কাছেই সসপেন ছিল—; কি মনে করে দেবযানী চায়ের জল সসপেনে ঢেলে দিয়ে কড়াইশুঁটির দানাগুলো ঢেলে দিল; দিয়ে উনুনের ওপর সসপেন চাপিয়ে দিল। কটা আলুর টুকরো আর টমাটো দেবে গোটা দুই। পরে দিলেই চলবে।

মাসলাগুলো ঘরে দিয়ে আসার জন্যে দেবযানী উঠে পড়ল।

রান্নাঘরে ফিরে এল দেবযানী একটু পরেই।

নিজের কথা ভাবতে বসলে দেবযানী নিজেই অবাক হয়ে যায়, কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল সে নিজেও ভাল বুঝল না। ছেলেবেলায়

যে মেয়ে মার বুক না খুঁটে ঘুমোতে পারত না, বাবার হাতে জুতো মোজা পরত, দিদিমার চোখের মণি ছিল—সে কি এই দেবযানী? লোকে জীবনের সঙ্গে নদীর তুলনা দেয়। এটা সহজ তুলনা। কিন্তু একেবারে যে বেমানান তাও নয়। নদীর কোনো সোজাসুজি সরাসরি পথ থাকে না, তার কোনো ধরাবাঁধা নেই, কোন পথ দিয়ে কোন বাঁক খেয়ে, কোথায় বাধা পেয়ে কেমন করে সে তার প্রবাহ বয়ে নিয়ে চলে আসে—বোঝা যায় না।

দেবযানী যে সংসারে জন্মেছিল তাতে তার জীবনের মোটামুটি একটা ধরাবাঁধা পথ থাকা উচিত ছিল; কিন্তু তাই কি থাকল? মনে তো হয় না। যদি থাকত তবে এই বয়েসে দেবযানীর কলকাতার কোনো বড় পরিবারের বউ হয়ে গোটা দুই ছেলেমেয়ে মানুষ করার কিংবা, বরের পাশে শুয়ে শুয়ে ঘরসংসারের গল্প করারই কথা ছিল। সেটা মানাত। কিন্তু এখন যা করছে দেবযানী এটা তাকে মানাচ্ছে না।

বাবা যখন মারা গেল তখন দেবযানী কিশোরী, বছর তেরো-চোদ্দ বয়েস। তার শরীর তখন বয়েস হিসেবে অতটা বাড়ন্ত হয় নি, একটু রোগা রোগা ছিল, মাথায় লম্বা দেখাত। বাবা তাকে শাড়ি ধরাতে দেয় নি। মা বাড়িতে মাঝে মাঝে শাড়ি পরাত। সাদা স্কার্ট ফ্রকের ওপর নীল রঙের হাতকাটা জোব্বা চাপিয়ে স্কুলে যেত দেবযানী, তার হাঁটা-চলার মধ্যে নাকি অহমিকা থাকত। লোকে বলত, তার চোখ নাকি রাস্তার কোনো দিকে পড়ত না—নাকের সিধে সে তাকিয়ে থাকত। কেন বলত দেবযানী জানে না।

বাবা মারা যাবার পর সংসারে একটা ধাক্কা লেগেছিল। তবে সে ধাক্কা সামলে নিতে অন্যদের তেমন দেরি হয় নি, শুধু মা আর দেবযানীর অনেকটা সময় লাগল। বিশেষ করে দেবযানীর। বাবার বুকের তলায় তার যে আশ্রয় ছিল তেমন আর কোথায় পাবে! আসলে বাবা বেঁচে থাকতে দেবযানী যা যা করার স্বাধীনতা পেত বাবা মারা যাবার পর সেই স্বাধীনতা যেন খর্ব হতে লাগল। মা

মেয়েকে অতটা মাথায় চড়তে দিতে চাইত না।

বড়দার বিয়ের বছর দেবযানী স্কুলের পড়া শেষ করে। বড় বউদি মানুষ খারাপ ছিল না—কিন্তু এমন এক বাড়ি থেকে এসেছিল যেখানে মেয়েরা স্বামী, সত্যনারায়ণ আর সন্তান ছাড়া আর কিছু বোঝে না। দেবযানীকে খুব কিছু ভাল চোখে দেখত না বড়বউদি। তার চাল চলনকে অপছন্দ করত।

মেজদা আর বড়দার মধ্যে বয়সের তফাত বছর তিনেকের। মেজদার চেহারা রাজপুত্রের মতন প্রায়, যেমন লম্বাচওড়া তেমনই মুখ হাত-পার গড়ন। কথায় বার্তায় ঝকঝকে। চেহারা আর গুণের জন্যে তার অফিসে টপাটপ প্রমোশান পেয়ে অফিসার হয়ে গেল। মা মেজদার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ছিল। মার মনে মনে ইচ্ছে ছিল, যদি সম্ভব হয় মেজ ছেলে আর মেয়ের বিয়ে একই সাথে মিটিয়ে দেবে। দেবযানী তখন কলেজে পড়ছে। মেয়ের সম্বন্ধ যা আসত মার তা পছন্দ হত না। একটা ভাল সম্বন্ধ পেয়েছিল, কিন্তু ছেলেরা এলাহাবাদে থাকে, ছেলের বাবা নাকি জজ; মা সে সম্বন্ধ বাতিল করে দিল, কেননা দূরে মেয়ে পাঠাবে না মা। মেজদার পাত্রীই বরং আগেভাগে পছন্দ হয়ে গেল মার। কলকাতার বনেদী বাড়ির মেয়ে, লেখাপড়া-জানা, দেখতে সুন্দর। মেজদার বিয়ে হয়ে গেল।

মেজবউদি শ্বশুরবাড়িতে এসে কিছুদিন সব নজর করল। ভীষণ চালাক। ওপর থেকে তার মতন মিষ্টি মানুষ আর হয় না, শাশুড়ীকে গলিয়ে ফেলল। বড়বউদি বোকা, মায়ের সঙ্গে যে তার বনিবনা হচ্ছে না—এটা প্রকাশ করে ফেলতে লাগল প্রকাশ্যে। মা যেন তাতে অসন্তুষ্টই হল।

এই সময়ে মা মারা গেল। সংসারে যখন ওপর ওপর সব ঠিক থাকলেও ভেতরে ভাঙন শুরু হয়েছে—ঠিক তখন।

মা মারা যাবার পর সংসারের চেহারা দেখতে দেখতে পালটে

গেল। বোধ হয় বড় বড় পরিবারের এই রকমই হয় ; যতক্ষণ মাথার ওপর কেউ থাকে যে রাশ টেনে ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে ততক্ষণ সকলেই কাছাকাছি পাশাপাশি, যেন একই রথ টেনে নিয়ে যাচ্ছে ; যে-মুহূর্তে সেই লোক সরে গেল ঘোড়ারা যে যার মতন ছিটকে চলে গেল। মা যে বাঁধন দিয়ে রেখেছিল তাতে সংসার ছিল বাঁধা, মা মারা যাবার পর ছড়িয়ে পড়ল, ছত্রাকার হয়ে গেল।

বড়দার হয়ত ধারণা ছিল, মা মারা যাবার পর সে হবে বাড়ির মাথা। বড়বউদি সংসারের একটা উঁচু আসনের আশা করত। সে সব আর হল না। বড়দা আর মেজদা, বড়বউদি আর মেজবউদিতে লেগে গেল। দুই ভাই আর তাদের বউয়ের রেষারেষি ইতরমি এমন জায়গায় নেমে গেল যে বাড়ির বাচ্চাকাচ্চারা পর্যন্ত কাকা জ্যেঠার ঘর মাড়াতে ভয় পেত। বড়দাকে কোনো ব্যাপারেই স্বাধীন ভাবে সংসারের কিছু করতে দেওয়া হত না। এমন কি কর্পোরেশনের চিঠির জবাব পর্যন্ত তার একার দেবার অধিকার ছিল না।

সংসারটা একটা হোটেলখানা হয়ে উঠল, যে যার মতন থাকে। যার যা খুশি করে, এজমালি রান্নাঘরের রান্নাঘর থেকে দু বেলার খাবার আসে মোটামুটি, বাকিটা যে যার নিজের ঘরে কিংবা বাইরে সেরে আসে। অসুখবিসুখে নিজের পছন্দমতন ডাক্তার আসে ঘরে। ওষুধ চলে। কেউ কারও খবর নেয় না, বা নিলেও সেটা মুখের খবর।

দাদাদের মধ্যে দেবযানীর সবচেয়ে কাছের লোক ছিল ছোড়দা। ছোড়দার স্বভাবটা ছিল অস্থির গোছের, কোনো দিকেই মন বসাতে পারত না ; লেখাপড়ায় তার মাথা ছিল মোটামুটি কিন্তু গোড়ার ক'টা বছর শুধু চেখে চেখে বেড়াল, একবার পড়ল সায়েন্স, তারপর গেল ডাক্তারি পড়তে, ছেড়ে দিয়ে আবার এল কমার্স পড়তে। কোনো রকমে সেটা শেষ করলেও চাকরি-বাকরিতে গা করল না। কিছুদিন ব্যবসা ব্যবসা করে মেতে থাকল, হরেক রকম কোম্পানীর নাম-

ছাপানো লেটার প্যাড্ তৈরী করে ঘুরে বেড়াল ; তারপর ব্যবসা ছেড়ে কোথাকার কোন বিস্কুট কারখানায় কাজ নিল। সেটাও ছেড়ে দিল মাস দুয়েকের মধ্যে। ছোড়দা যে বছরে কতবার একটা ছেড়ে অন্য একটা ধরেছে তা দেবযানীরও জানা নেই। শেষে তার বিয়ে করার শখ চাপল।

ছোড়দার বিয়েটা পুরোপুরি তার পছন্দের এমন কথা বলা চলে। বহরমপুরে কোন বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিল বেড়াতে, সেখানে একটি মেয়েকে দেখে খুব মনে ধরে যায়। কলকাতায় ফিরে এসে বাড়িতে বউদিদের কাছে সরাসরি তার বিয়ের ইচ্ছেটা জানিয়ে দেয়।

ছোটবউদি সাধারণ পরিবার থেকে এসেছে ; তার কোনো অহঙ্কার নেই, গালভরা কথা নেই। বরং তার মধ্যে সাধারণ মানুষের ছোট ছোট দোষগুণ আছে। দেখতে যে প্রতিমা তা নয়, পুতুলও নয়, তবে ছিপছিপে চেহারার মধ্যে ভীষণ টান আছে, চোখে ধরে যায়। ছোড়দারও বোধ হয় সেজন্যে চোখে ধরেছিল।

বিয়ের পর ছোড়দা কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষ হয়ে গেল। তার খেয়াল-খুশির পালা চুকিয়ে সে কাজের লোক হয়ে পড়ল। এখন আর সে-ছোড়দা নেই, বন্ধুর সঙ্গে মিলেমিশে কাশীপুরে কারখানা খুলেছে ছোট ছোট যন্ত্রপাতির, লোহার টুকটাক জিনিস তৈরী করে। ভালই আছে ছোড়দা।

সংসারের এই অবস্থার মধ্যে—মানে মা মারা যাবার পর থেকে যে ঘোলা জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল—সেই স্রোতের মধ্যে দেবযানীর দিকে কেউ নজর দেয় নি। হঠাৎ হঠাৎ কিংবা মুখে দু-চার বার দাদাদের টনক নড়ে ওঠার ভাব দেখা দিলেও সত্যি সত্যি কেউ তার জন্যে ব্যস্ত বা উদ্বিগ্ন হয় নি। মেজদা চাইত বড়দা বোনের দায়িত্ব নিক, বড়দা চাইত মেজদা নিক, আর ছোড়দা, যে নিজের দায়িত্বই নিতে জানত না সে আর বোনের দায়িত্ব কী নেবে ? তবে সব দোষ দাদাদের ঘাড়ে

চাপানো উচিত নয়। দেবযানী নিজেই এমন একটা জীবন কাটাত যাতে তার ওপর খবরদারি করার সাহস দাদাদের হত না। কোনো দিনই সেটা হয় নি। বাবার আমলে নয়, মার আমলেও নয়। পরে আর কেমন করে হবে! দেবযানী নিজের মতন থাকত, সংসারের কোনো ব্যাপারেই তার ঔৎসুক্য ছিল না, গরজও ছিল না, সম্পর্কও ছিল ছাড়া ছাড়া। দাদাদের ব্যাপার-স্যাপার সে পছন্দ করত না, তার ব্যাপারেও কারও কৌতূহল সে বরদাস্ত করতে রাজী ছিল না।

দেবযানীর যখন পড়াশোনা শেষ হয়ে আসছে তারও কিছু আগে থেকে নীলেন্দুর সঙ্গে তার পরিচয়। নীলেন্দু ছোড়দার উদয়ন ক্লাবের খেলোয়াড় ছিল; খুব পেটোয়া ছিল ছোড়দার। কলেজে পড়ত নীলেন্দু, থাকত উল্টোডিঙির দিকে; ছোড়দা তাকে কোথায় ফুটবল খেলতে দেখে নিজের দলে টেনে এনেছিল। নীলেন্দু ভাবত, ছোড়দা তাকে কলকাতার কোনো বড় ক্লাবে নিশ্চয় ঢুকিয়ে দেবে। ছেলেমানুষ, খেলার নেশায় পেয়ে বসেছে, তার এসব ভাবনা কোনোটাই অযৌক্তিক নয়। ছোড়দাও নীলেন্দুকে খুব ভালবাসত।

বাড়িতে হরদম নীলেন্দুর আসা-যাওয়া থেকে দেবযানীর সঙ্গে আলাপ। সেই আলাপ জমেও উঠল বেশ। বয়েসের দিক থেকে দুজনের মধ্যে এমন একটা তফাতও ছিল না, বছর দুই-তিন বড় জোর। দুজনে বন্ধুর মতন হয়ে উঠেছিল। একসঙ্গে কত যে ঘোরাঘুরি, হুড়োহুড়ি করেছে। নীলেন্দুর ছেলেমানুষী স্বভাব, তার সজীবতা, উদাত্ত স্বর, অফুরন্ত জীবনীশক্তি দেবযানীকে মুগ্ধ করে রাখত। অথচ, সমস্ত চাপল্যের মধ্যে নীলেন্দুর একটা জায়গায় সীমানা বাঁধা ছিল, সে দেবযানীকে বন্ধুত্ব ও প্রীতির বাইরে অন্য কোথাও বসাতে চায় নি। দেবযানীও নয়।

ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে দেবযানী তার হাত ফাঁকা দেখে কি করব কি করব ভাবতে গিয়ে মেয়ে-স্কুলে একটা চাকরি নিয়ে নিল। মাস আষ্টেক পরে তার ফিলজফির মাঝারী ফলাফল দেখিয়ে কলকাতা

শহরের গায়ে মেয়ে-কলেজে একটা চাকরি পেয়ে গেল। সকালের কলেজ। বাড়ি থেকে ভোর ভোর ছুটত, ফিরত বেলায়; ছুপুরটা বাড়িতে কাটিয়ে বিকেলে নীলেন্দুর সঙ্গে এখান-ওখান করে বেড়াত।

নীলেন্দু চেয়েছিল খেলোয়াড় হতে; যত দিন যেতে লাগল—সে খেলাটাকে আর আমলে আনতে চাইল না। দেবযানী দেখল, নীলেন্দু বড় তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে। এম. এ. পড়তে ঢুকে ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দিল, তার বিকেলের ঘোরাফেরা কমে যেতে যেতে বন্ধ হয়ে এল, দেবযানীদের বাড়িতেও আর আসত না।

দেবযানীর বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগত, মন উশখুশ করত, রাগও হত কখনো কখনো।

একদিন নীলেন্দু বলল, 'চলো, তোমায় এক জায়গায় নিয়ে যাই।'

'কোথায়?'

'চলো না; দেখতেই পাবে।'

নীলেন্দুর সঙ্গে দেবযানী দেশবন্ধু পার্কের দিকে একটা বাড়িতে এসে মহীতোষকে দেখল। সন্ধ্যের মুখে স্নান সেরে আদুল গায়ে মহীতোষ বসে ছিল। বৈশাখ মাসের গরমে কলকাতা তেতে পুড়ে ঘেমে মরছে।

দেবযানীকে দেখে মহীতোষ যেন সামান্য অপ্রস্তুত বোধ করে গায়ে একটা গেঞ্জি চাপিয়ে নিল।

প্রথম পরিচয়। সাধারণ কিছু কথাবার্তা। মেটে রঙের কানা-ভাঙা কাপে তিন কাপ চা। সস্তা সিগারেটের বিশ্রী গন্ধ আর ধোঁয়া। দেবযানীর মোটেই ভাল লাগছিল না।

বাইরে এসে দেবযানী বলল, 'তোর ওই মহীদাদা কি করে রে?'

নীলেন্দু বলল, 'তোমার মতন মাস্টারি করে।'

'কোথায়?'

'বাইরে করত। বর্ধমানের দিকে।...এখন আর করবে না।'

'কেন?'

'কি হবে করে? কিসের জন্যে মাস্টারি? কার জন্যে মাস্টারি?...তোমাদের এই বইয়ের বিদ্যে প্রেসার কুকারে গলিয়ে যাদের পেটে দিচ্ছ তারা ওই বিদ্যে নিয়ে কি করবে, দেবীদি? এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে গিয়ে লাইন মারবে আর দু বেলা মা-বাপের চোখের কাঁকর হয়ে থাকবে। এই তো?'

দেবযানী অবাক চোখে ঘাড় ঘুরিয়ে নীলেন্দুকে দেখতে লাগল। আজকাল নীলেন্দু যে তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে এটা দেবযানী লক্ষ্য করেছিল। অনেকবার জিজ্ঞেসও করেছে, 'তোর কি হয়েছে রে?' নীলেন্দু স্পষ্ট করে কিছু বলত না, অস্পষ্ট করেও তার এই পরিবর্তনের আভাস দিতে চাইত না। শুধু বলত, 'আমার কিছু ভাল লাগে না, দেবীদি। চারদিকের ব্যাপার-স্যাপার অসহ্য লাগে। এভাবে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না।'

নীলেন্দু যে বেশ কিছু ছেলের মতন হতাশ, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে দেবযানী বুঝতে পারছিল। বুঝতে পারছিল, কোনো টান তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অনেকের মতন, কোনো আবেগ তাকে সাধারণ জীবনযাপনের একঘেয়েমি থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যে ছেলের জীবনের উদ্দেশ্য কিংবা শখ ছিল কলকাতার ফুটবল মরসুমে বড় ক্লাবের হয়ে খেলতে নেমে হাততালি কুড়োবে—সেই ছেলে খেলাধুলোর কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে জীবন সম্পর্কে কেমন সচেতন হয়ে পড়তে লাগল ক্রমশ। দেবযানীর খারাপ লাগত না; বরং ভালই লাগত। অনেক সময় দেবযানী নীলেন্দুকে আদর করে বলত, 'তুই যে একেবারে দাউ দাউ করে জ্বলছিস আজকাল। বিপ্লব-বহ্নি নাকি রে?' নীলেন্দু হাসত।

বলতে নেই, এই নীলেন্দুর জন্যেই মহীতোষের সঙ্গে দেবযানীর পরিচয় এবং যোগাযোগ, নীলেন্দুর জন্যেই মহীতোষের সঙ্গে প্রথম প্রথম কিছু রুক্ষ বাক্যবিনিময়। অথচ, জীবনে এমন ঘটনা হামেশাই ঘটে—যেখানে আদি আর মধ্যর মধ্যে কোনো মিল খুঁজে

পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। দেবযানী মহীতোষকে প্রথম দিকে বিশেষ পছন্দ করে নি; প্রথম দর্শনে তার প্রেমোদ্রেকও হয়নি; মহীতোষের কোনো কিছুই তাকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে নি। কিন্তু ক্রমশ কেমন করে যেন দেবযানী মহীতোষের আকর্ষণে পড়ে গেল। তাকে ভালবেসে ফেলল। এই ভালবাসার দুটো পর্ব। প্রথম পর্বে দেবযানী ছিল মহীতোষের ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের দ্বারা আচ্ছন্ন। দ্বিতীয় পর্বে সে মহীতোষকে, মনে হয়, অনেকটা নিজের মনোমত পথে আনতে পেরেছে।

এসব অবশ্য সহজ সরল ব্যাপার নয়, রাতারাতি কিছু ঘটে নি। অনেক সময় গিয়েছে, অনেক ভয়-ভাবনা, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তার দিন কাটিয়ে তবে মহীতোষকে দেবযানী এই অবস্থায় দেখতে পাচ্ছে।

বাড়িতে দেবযানী আর মহীতোষের ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কারও অজানা ছিল না। দাদা-বউদিরা এসব পছন্দও করে নি। কিন্তু দেবযানী কারও পছন্দের মুখ চেয়ে থাকত না, সে অভ্যেস তার ছিল না। ছন্নছাড়া সংসারে কে কার অভিভাবকত্ব করবে, কারই বা সে উৎসাহ আছে। যাই হোক, বাড়ির অবস্থাটা এমন ছিল না যে, দেবযানী দাদাদের দিয়ে বিয়ের মেরাপ বেঁধে ছাদনাতলায় দাঁড়িয়ে মহীতোষের গলায় বরমাল্য দেবে। দাদারা রাজী হত না, সে মনোভাব তাদের ছিল না। মহীতোষও বরবেশে এ-বাড়িতে আসত না। কাজে কাজেই দেবযানী একদিন বাড়ি ছেড়ে চলে এল। আসার আগে সে তার নিজের গয়নাগাটি নিয়ে এসেছে। একে ঠিক পালানো বলে না। বাড়ি ছেড়ে চলে আসা বলে। দেবযানী সেই ভাবেই এসেছে। দাদারা যে খুশী হবে না—এটা তার জানা ছিল। সে গ্রাহ্যও করে নি। এখনও করে না।

বারান্দায় শব্দ হল। দেবযানী অন্যমনস্ক থাকায় একটু বোধ হয় চমকে উঠেছিল শব্দে। তাকাল। বারান্দায় আলো নেই। রান্না-

ঘরের খুব ম্লান আলোয় মনে হল মহীতোষ বারান্দা দিয়ে কোথাও যাচ্ছে। পায়ের কাছে কিছু ছিল, ধাক্কা লেগে পড়ে গেছে।

দেবযানী চায়ের কাপ গুছিয়ে নিল। কড়াইশুঁটির রান্নাটা শেষ হয়ে এসেছে। গন্ধ আসছিল। উনুনের তাতে হাত-পা বেশ গরম হয়ে এসেছে দেবযানীর। কপালের ওপর চুল এসে পড়েছে। চুল সরিয়ে নিয়ে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সামান্য পরে দেবযানী নীলেন্দুর ঘরে এল। এসে দেখল, নীলেন্দু কোলের ওপর কম্বল চাপিয়ে বিছানায় বসে আছে, মহীতোষ তার মুখোমুখি, বিছানার ধার ঘেঁষে বসে। গল্প করছে দু জনে।

দেবযানী হাত বাড়াল। "কড়াইশুঁটি সেদ্ধ; খাও। খুব গরম। সাবধানে ধরো, গায়ে ফেলো না।" অ্যালুমিনিয়ামের বাটিটা এগিয়ে দিল দেবযানী, খুব গরম বলে বাটির তলায় কাচের প্লেট বসিয়ে এনেছে।

নীলেন্দু খাবার নিয়ে চামচ দিয়ে বাটির মধ্যে ঘাঁটতে লাগল। সত্যিই খুব গরম, ধোঁয়া দেখা না গেলেও গরম ভাপ অনুভব করা যাচ্ছিল। নাকের কাছাকাছি বাটিটা এনে টমাটো, কড়াইশুঁটি, কাঁচা লঙ্কার গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে নীলেন্দু মোহিত হবার ভঙ্গি করে বলল, "বাঃ, এ যে খাসা ব্যাপার!"

দেবযানী আর দাঁড়াল না। চা আনতে হবে।

রান্নাঘরে এসে চা ঢালল দেবযানী, চিনি মেশাল। মহীতোষ নামমাত্র চিনি খায়। তার খাওয়া-দাওয়া যেন হিসেব করা। এ-সব আগে ছিল না, মহীতোষ কোনো দিনই এমন কিছু ভোজনরসিক মানুষ নয়, তবু সাধারণ ক্ষুধাতৃষ্ণায় তার অরুচি ছিল না। ইদানীং নানা ব্যাপারেই তার আপত্তি; বিকেলের দিকে সামান্য কিছুও মুখে দিতে চায় না, এক-আধ পেয়ালা চা যেন যথেষ্ট, সেই রাত্রে দু-চারখানা রুটি, সামান্য সবজি, একটু দুধ। এতে শরীরস্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে কি হচ্ছে না এ নিয়ে দেবযানী প্রথম দিকে রাগারাগি করেছে,

কোনো লাভ হয়নি। এখন আর কিছু বলে না।

চা নিয়ে দেবযানী নীলেন্দুর ঘরে ফিরে এল। মহীতোষকে দিল। নীলেন্দু বেশ তৃপ্তির সঙ্গে কড়াইশুঁটি সেদ্ধ খাচ্ছে। বিছানার পাশে কাঠের চেয়ারে আগুনের মালসা রাখা, তলায় এক টুকরো কাঠ। নীলেন্দুর চায়ের কাপ চেয়ারের একপাশে নামিয়ে রাখল দেবযানী।

"তোমার এই বস্তুটি সাংঘাতিক উপাদেয় হয়েছে দেবীদি, আমি তোমায় সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে যাব।" নীলেন্দু ছেলেমানুষের মতন হাসল। "বসো—!"

দেবযানী বসল না। বলল, "রান্নাঘরে আমার কাজ রয়েছে।"

"তুমি চা খাবে না?"

"খাব।"

"কই, নিয়ে এস।...কাজ তো আছেই, থাকবে। একটু বসো। অন্তত চা-টুকু খাও।"

যেন বাধ্য হয়েই দেবযানী নিজের চা আনতে রান্নাঘরে গেল; ফিরে এল একটু পরেই। ফিরে এসে বিছানার একপাশে পায়ের কাছে বসল।

দু-চারটে কথার পর নীলেন্দু হঠাৎ বলল, "দেবীদি, এখন মেজাজটা কি রকম তাস-খেলার মতন হয়েছে। এক জোড়া তাস পেলে ফার্স্ট ক্লাস হত। জমে যেত।" বলে হাসতে হাসতে মহীতোষের দিকে তাকাল। "তুমি জানো না মহীদা, দেবীদি আর আমি একসময়ে তাসের পার্টনার ছিলাম। দেবীদি দারুণ খেলে।"

মহীতোষ হাসিমুখে দেবযানীকে দেখতে দেখতে বলল, "দেবীর সঙ্গে আমি দাবা খেলেছি। ওকে হারানো মুশকিল।"

"তুমি আরও বড় খেলোয়াড় মহীদা, খেলাও বড় খেলেছ। আমি ছোট খেলোয়াড়—!" বলে নীলেন্দু হোহো করে হেসে উঠল।

দেবযানী নীলেন্দুর মুখ দেখতে লাগল, হাসি দেখল। তার

আচমকা মনে হল, নীলেন্দু ইচ্ছে করে, তার মনের জ্বালা মেটাবার জন্যে মহীতোষকে এই খোঁচাটা দিল। এর কি কোনো দরকার ছিল? মহীতোষ কি একলাই বড় খেলোয়াড়? তুমি কি কিছু কম নীলেন্দু?

যেন কিছুই নয়, সহজ গলায় দেবযানী নীলেন্দুকে বলল, "তুমি এখনও সেই তোমাদের—কি যেন নাম ছিল ক্লাবটার—সেই ছোট ক্লাবের খেলোয়াড়ই থেকে গেলে? তাই না?"

নীলেন্দু প্রথমটায় বুঝতে পারে নি। পরে বুঝল। বুঝে কেমন অপ্রস্তুতভাবে হাসল।

## পাঁচ

জানলা খোলার শব্দে নীলেন্দু সাড়া দিয়ে বলল, "দেবীদি?"

দেবযানী জানলা খুলে দিল। বাইরে রোদ। আলো ছড়িয়ে গেল ঘরে। বেলা হয়েছে বোঝা যায়।

"আর না, এবার ওঠো—" দেবযানী বলল। শান্ত, মিষ্টি গলা; সকালের সঙ্গে যেন চমৎকার মানানসই শোনাল।

নীলেন্দু আলস্যের গলায় বলল, "কটা বাজল?"

দেবযানী বিছানার মশারি খুলতে খুলতে বলল, "অনেক বেলা হয়েছে। এতো ঘুম তুমি ঘুমোও কি করে?"

নীলেন্দু জবাব দিল না। শুয়ে শুয়ে দেখতে লাগল, দেবীদি পায়ের দিকের মশারি খুলে মাথার দিকে চলে গেল। মশারির আড়াল থেকেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দেবীদিকে। সাধারণ শাড়ি, কাঁধের ওপর ভেঙে পড়া খোঁপা, লম্বা লম্বা ফরসা হাত, দুগাছা করে সোনার চুড়ি। দেবীদির পিঠের সেই সামান্য বাঁকানো ভঙ্গি, কোমরের ভাঁজ—কিছুই নষ্ট হয় নি।

মশারি খুলে ফেলে দেবযানী বলল, "তুমি আজকাল খুব কুঁড়ে হয়ে পড়েছ।" বলতে বলতে নীলেন্দুর গায়ের ওপর থেকে মশারি টেনে নিল দেবযানী।

গলা পর্যন্ত মোটা কম্বলে ঢাকা নীলেন্দুর ; বাসি মুখে দেবযানীর দিকে তাকিয়ে হাসল যেন। বলল, "দেবীদি, কতকাল পরে আজ আবার এই শুভ ঘটনাটি ঘটল বলতে পার ?"

দেবযানী বুঝতে পারল না। বলল, "কোন শুভ ঘটনা ?"

হাসিমুখে নীলেন্দু দেবযানীকে দেখতে দেখতে হালকা অথচ আন্তরিক গলায় বলল, "সকাল বেলায় তোমার মুখ দেখলাম, প্রথম মুখ। তুমি আমার ঘুম ভাঙিয়ে বিছানা তুলে দিচ্ছ।...আহা, এমন মধুর স্বপ্ন সেই কবে যেন দেখেছিলুম, তারপর ভুলেই গিয়েছিলাম।"

দেবযানী হেসে ফেলল। এমন করে কথা বলে নীলেন্দু, না হেসে পারা যায় না। বলল, "থাকো না এখানে, রোজই নিজের হাতে বিছানা তুলে দেব।"

"লোভ দেখিয়ো না, তুমি লোভ দেখালে এখনও আমার—কি বলে যেন—রক্তের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।"

দেবযানী আর দাঁড়াল না, চলে গেল।

নীলেন্দু উঠল। সমস্ত মন প্রফুল্ল। শরীরও বেশ ঝরঝরে লাগছিল। কালকের ক্লান্তি যেন কোথাও আর নেই। জানলার বাইরে রোদ ঝকঝক করছে। বেলা হয়েছে মন্দ নয়। হাই তুলে, মাথার ওপরকার সিলিংটা একবার দেখল নীলেন্দু। এখনও সামান্য ঝাপসা হয়ে রয়েছে। হাতকাটা সোয়েটারটা গায়ে পরে চাদর জড়িয়ে নীলেন্দু মুখ ধুতে চলে গেল।

কুয়াতলায় মুখ ধোয়ার সময় নীলেন্দু মহীতোষকে দেখতে পেল। বাগানে লাটুর সঙ্গে কথা বলছে।

নীলেন্দু শব্দ করে মুখ ধুতে লাগল। মহীতোষ দেখল।

"কি রে, ঘুম ভাঙল ?" মহীতোষ সামান্য তফাত থেকেই বলল।
"খুব ঘুমিয়েছি।...তোমার মর্নিং ওয়াক হয়ে গেছে ?"
"কেন, তুই সঙ্গে যাবি নাকি ?" মহীতোষ হেসে জবাব দিল।
"আজ আর হল না। কাল—।" নীলেন্দুও পরিহাস করে বলল।

মুখটুখ ধুয়ে মুছে এসে নীলেন্দু রান্নাঘরের কাছে ঢাকা বারান্দায় রোদে বসল। চা এনে দিল দেবযানী।

চা খেতে খেতে নীলেন্দু বলল, "দেবীদি, আজ আমার ফাইন লাগছে। কেন লাগছে বলো তো ?"

দেবযানী পাশের দিকে চেয়ারে বসে ছিল। বলল, "কি করে বলব। তোমার মন তুমিই জানো।"

নীলেন্দু বিস্ময়ের ভান করল। "আমার মন শুধু আমিই জানি। তুমি কিছু জানো না দেবীদি ?"

সহাস্য মুখে দেবযানী বলল, "আমার কি জানার কথা !"

নীলেন্দু অভিমানের মতন মুখ করল। তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক। তারপর বলল, "এই চমৎকার সকালে বড় দুঃখ দিলে। মেয়েরা এই রকমই হয়। এক হাতে সুধাপাত্র, অন্য হাতে বিষভাণ্ড। একটু আগে সকালে তুমি আমায় পরম সুখ দিয়েছিলে, আর এখন চরম দুঃখ দিলে।"

দেবযানী জোরে হেসে উঠল। হাসির দমকে তার বুক কাঁপছিল, গলার নালী ফুলে ফুলে উঠছিল। হাসতে হাসতে টেবিলের ওপর যেন একটু নুয়ে পড়ল।

নীলেন্দু টেবিলের ওপর রাখা সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে ধরাল। দেবীদির এই হাসি তার বড় বেশী চেনা, হাসির ওই মুক্ত ধ্বনি, ওই ভঙ্গি তার কানে লেগে আছে কতকাল ধরে। এই হাসি দেবীদির চরিত্রকে বোধ হয় খানিকটা প্রকাশ করে, তার চরিত্রের নিশ্চিন্ত, উচ্ছল দিকটাই সম্ভবত। নীলেন্দু আশঙ্কা করেছিল, দেবীদির

পুরোনো হাসি আর শোনা যাবে না। জীবনের যে অবস্থায় ওই হাসি স্বাভাবিক ছিল এখন সে অবস্থা নেই।

নীলেন্দু গম্ভীর মুখ করে বলল, "মহীদা আমার কত বড় ক্ষতি করেছে আমিই বুঝতে পারছি।"

হাসিমুখে দেবযানী বলল, "যাক্ গে—তোমার মনের কথাটা শুনি।"

"শুনবে ?"

"ওমা, শুনব না ?"

"তা হলে বলি।···কাল আমি একটা বিরাট স্বপ্ন দেখেছি।"

"স্বপ্ন !···খুব ভাল স্বপ্ন ?"

"খুব ভাল। অন্তত আমার পক্ষে। যদি স্বপ্নটা না ভাঙত—আমি আরও দেখতে রাজী ছিলাম।" বলতে বলতে নীলেন্দু চায়ের কাপটা বাড়িয়ে দিল। "আর এক পেয়ালা দাও-না, দেবীদি। আছে ? এই ঠাণ্ডায় তোমার ওই মিনি সাইজের কাপে আমার পোষায় না।"

দেবযানী আরও চা রেখেছিল। কাপটা তুলে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

নীলেন্দু আরাম করে সিগারেট খেতে লাগল। সকালের প্রথম দু-এক কাপ চা, দু-চারটে সিগারেট তার ভালই লাগে, শরীর মন যেন চাঙ্গা করে দেয়। পরে আর তা হয় না। অথচ অভ্যেস। ভাল না লাগলেও খেয়ে যেতে হয়। সে মাঝে মাঝে বেশ গম্ভীর হয়ে ভেবেছে, জীবনের প্রথম দিকে কোনো কোনো ব্যাপার গোড়ায় যতটা ভাল লাগে পরে কি আর তা অত ভাল লাগে ? বোধ হয় নয়। অভ্যেসই মানুষকে চালায়। ভাল লাগা হয়ত চালায় না।

চা এনে দিয়ে দেবযানী বলল, "তোমার স্বপ্নটা শুনি।"

চায়ে চুমুক দিল নীলেন্দু, হাতের সিগারেটের টুকরোটার আগুনে নতুন একটা ধরিয়ে নিল। বলল, "স্বপ্নের দোষ হল, দেখার সময় যত

বড় মনে হয়, মনে করার সময় সেটা তত ছোট হয়ে যায়। এ যেন ইলাস্টিক, দেখার সময় টেনে বাড়িয়ে তোমায় দেখাল, তারপর আবার গুটিয়ে গেল।" নীলেন্দু হাসল, তার ঝকঝকে চোখ কি যেন ইঙ্গিত করতে চাইল দেবযানীকে। শেষে বলল, "স্বপ্ন দেখছিলাম, কলকাতায় একটা বাড়ির দোতলা কিংবা তেতলার ঘরে আমি শুয়ে আছি, মাথার দিকের জানলা খোলা, ট্রামের শব্দ ভেসে আসছে অনবরত, তখন বিকেল না সন্ধে মনে করতে পারছি না, হঠাৎ দেখি দরজা খুলে কে একজন এল। প্রথমে মনে হয়েছিল কঙ্কর, তারপর দেখলাম কঙ্কর নয়, সিদ্ধার্থ। সিধুর বেসামাল অবস্থা। প্রচুর মদ খেয়েছে। সমস্ত মুখে দরদর করে ঘাম ঝরছে। চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। হাতে একটা রিভলবার। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। বিছানা ছেড়ে উঠতে যাব দেখি উঠতে পারছি না। কেন পারছিলাম না জানি না। সিধু তার হাতের রিভলবারটা আমার বালিশের পাশে রেখে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমার কোনো দোষ নেই, তোর কাছে পৌঁছে দিয়ে গেলাম।…তারপর দেখি, আমি অন্য জায়গায়। আমার সঙ্গে তুমি। সেই যে একবার আমরা ডায়মণ্ড হারবার গিয়েছিলাম দেবীদি, তোমার মনে আছে ? কোন্ গ্রামে বেড়াতে গিয়ে ফেরার পথে আর বাস পেলাম না, এক চাষীর বাড়িতে রাত কাটাতে হল। তারা ভেবেছিল, আমরা স্বামী-স্ত্রী। আমাদের একটা ঘরে রাত কাটাতে দিল। তোমায় আমার বউ ভেবে নেবার কারণ ছিল না, তোমার সিঁথিতে সিঁদুর ছিল না। তবু—। ঠিক সেই রকম এক একচালা ঘরে তুমি আর আমি। তুমি আমার বুকের ওপর শুয়ে আদর করছ। মাথার চুলে বিলি কেটে দিচ্ছ। দিতে দিতে হঠাৎ তুমি আমার চোখে তোমার মাথার কাঁটা ফুটিয়ে দিলে। আমি বিল্বমঙ্গল হয়ে গেলাম। তুমি তখন কাঁদছ…।" নীলেন্দু চুপ করল, দেখল দেবযানীকে, চোখে যেন কৌতুক, চায়ে চুমুক দিল আবার।

দেবযানী কথা বলল না।

নীলেন্দু ঠাট্টার গলায় বলল, "সত্যি বলছি দেবীদি, তোমার বুকের চাপ যেন আমি সারাক্ষণ অনুভব করেছি।"

দেবযানী বলল, "আর চোখের মধ্যে যখন মাথার কাঁটা ফুটিয়ে দিলাম—তার যন্ত্রণা?"

"সে-যন্ত্রণা তো নতুন নয়···। যাক্ গে, স্বপ্নটা তোমার কেমন লাগল?"

"খুব খারাপ।"

"কেন?"

"আমায় তুমি এখন থেকে বউদি বলবে।"

নীলেন্দু হেসে উঠল। জোরে। দেবযানীও হেসে ফেলল।

চা শেষ করে নীলেন্দু বলল, "এই স্বপ্ন হয়ত কিছু না, দেবীদি; তবু তোমার কাছে মিথ্যে বলব না, সিধু আমি আমরা একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। কি স্বপ্ন তুমি জানো। মহীদা আমাদের মধ্যে ছিল। তুমি জানো আমরা সত্যি সত্যি সকলে রিভলবার পকেটে গুঁজে ঘুরে বেড়াই নি। ওই জিনিসটা কেউ কেউ হাতে নিয়েছিল। আমরা নয়। যারা নিয়েছিল তারা আলাদা হয়ে গেল। সিধু নেব কি নেব না করতে গিয়ে মারা গেল।"

"সিধু মারা গেছে?" দেবযানী যেন চমকে উঠল। "কই বলো নি তো?"

"তোমায় বলি নি। মহীদাকে বলেছি কাল।"

"আমি শুনি নি।"

"সিধুকে তুমি পছন্দ করতে না। বলতে, ওকে দেখলে তোমার ভয় করে।"

"আমার পছন্দ অপছন্দর ওপর একটা লোকের মরাবাঁচা নির্ভর করে না," দেবযানী কেমন অন্যমনস্ক উদাস গলায় বলল। একটু থেমে আবার বলল, "সিধুকে আমার ভাল লাগত না; কিন্তু সে মারা

ষাক এ তো আমি চাই নি।…কবে মারা গেছে ?”

“মাস দুয়েক আগে।”

“কলকাতাতেই ?”

“না, নৈহাটির দিকে। পুলিস মেরেছে না অন্য কেউ জানি না।”

দেবযানী চুপ করে থাকল। কেমন একটা স্তব্ধতা এসেছে হঠাৎ। মহীতোষ বাগানের দিক থেকে এগিয়ে আসছে। ক'টা চড়ুই পাখি পাক খেয়ে কুয়াতলা থেকে উড়ে গেল। কোথাও কোনো শব্দ নেই। বারান্দায় রোদ ছড়িয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। রান্নাঘরের একটা দরজা বাতাসে সামান্য বেঁকে গেল।

নীলেন্দু বলল, “আমি তোমার সঙ্গে অনেক ঝগড়া করেছি দেবীদি, অনেক জ্বালিয়েছি। মহীদাকে আমি যতটা পছন্দ করি তোমাকে তার চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়। তুমি ভেবো না—শুধু মহীদার সঙ্গে আমার লড়াই সেরে আমি ফিরে যাব। তোমার সঙ্গেও আমার ঝগড়া আছে।”

দেবযানী যেন হঠাৎ কেমন বিষণ্ণ চোখে নীলেন্দুর দিকে তাকাল। তার মনে হল, নিজেরও যেন অনেক কিছু বলার রয়েছে নীলেন্দুকে মহীতোষকে যা বলা যাবে না।

“বেশ তো, ঝগড়া করো,” দেবযানী মৃদু গলায় বলল।

“কিন্তু ছেলেমানুষের ঝগড়া নয় দেবীদি। সে আগে অনেক করেছি।”

“না না, বড় মানুষের ঝগড়াই করো।”

“তুমি আমার স্বভাব জানো। আমায় তুমি গলাধাক্কা দিয়েও তাড়াতে পারবে না—যতক্ষণ না আমি বিদায় নিচ্ছি। কাজেই সাবধান—।”

রোদের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মহীতোষ বলল, “নীলু, তুই সাইকেল চালাতে জানিস ?”

এ-রকম ছেলেমানুষী প্রশ্নের জন্যে নীলেন্দু তৈরী ছিল না,

খানিকটা অবাক কিছুটা বা মজার মুখ করে মহীতোষকে দেখতে দেখতে বলল, "জানি। কেন?"

"আমি জানি না।"

হেসে ফেলল নীলেন্দু। "হঠাৎ তোমার সাইকেল চড়তে শেখার কথা মনে হল কেন?"

মহীতোষ হাসিমুখে বলল, "একটা সাইকেল আমার দরকার। নতুন সাইকেলের দাম কত রে?"

"জানি না।"

"বেশী হলে পুরোনো একটা কিনব।"

নীলেন্দু কিছুই বুঝতে পারছিল না। মহীতোষের সঙ্গে সে বাইরে ঘুরে বেড়াতে বেরিয়েছে। মহীতোষই নিয়ে এসেছে। রোদের মধ্যে হাঁটতে এখন পর্যন্ত ভালই লাগছে তার। শীতের পরিষ্কার আকাশে সূর্য জ্বলজ্বল করছিল। মাঠঘাটের কোথাও বিন্দুমাত্র আর্দ্রতা নেই, গাঢ় তপ্ত রোদ সব কিছু শুকনো খসখসে করে ফেলেছে। শীতে ঘাস মরে যাচ্ছে মাঠের, কোনো কোনো গাছের পাতা শুকিয়ে ঝরতে শুরু করেছে। কাছাকাছি কোনো বনজঙ্গল নেই, উঁচু নীচু মাঠ, দু-পাঁচটা গাছ, ঝোপঝাড়, এক-আধ টুকরো ক্ষেত চোখে পড়ে। অল্প দূরে বালিয়াড়ির মতন মাটির স্তূপ দেখা যাচ্ছিল খানিকটা।

নীলেন্দু হেসে বলল, "তোমার এই বুড়ো বয়েসে সাইকেল শেখার শখ হল কেন?"

মহীতোষও হাসিমুখে জবাব দিল, "শখ নয় রে, দরকার। আমার প্রায় সারাদিন অনেকটা ঘোরাঘুরি করতে হবে। হেঁটে পারব না, সময় নষ্ট হবে।"

নীলেন্দু কিছু না বলে হাঁটতে লাগল। নানা রকম অনুমান করছিল, কোনোটাই যেন পছন্দ হচ্ছিল না।

আরও খানিকটা এগিয়ে এসে মহীতোষ বাঁ দিকে সামান্য খাড়াই মতন জায়গার দিকে পা বাড়াল। নীলেন্দুও।

খাড়াই পেরিয়ে এসে মহীতোষ সামনের দিকটা দেখাল। বলল, "ওই দেখ—।"

নীলেন্দু প্রথমটায় বুঝতে পারল না কি দেখবে ; শেষে কাঠের ছোট ছোট খুঁটি দেখল, হাত দুই-আড়াইয়ের মতন রোগা রোগা খুঁটি মাটির সঙ্গে পোঁতা।

নীলেন্দু বলল, "কি ওটা ? কি দেখব ?"

মহীতোষ সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, "আয়, বসি। তোকে বলছি।"

কাছাকাছি গাছ খুঁজে ছায়ায় বসল মহীতোষ। নীলেন্দু মাটিতে বসে পা ছড়িয়ে সিগারেট ধরাল।

মহীতোষ অল্প সময় চুপচাপ থেকে শেষে বলল, "ওই জমিটা কিনেছি আমরা।"

নীলেন্দু মহীতোষের চোখের দিকে তাকাল। তার মাথায় কিছু ঢুকছিল না।

"খুব বেশী জমি নয়। বিঘে দশেক। বিঘে দশও কম নয়—" মহীতোষ বলল, "এখানকার মাটি জঙ্গলের, মানে কিছুদিন আগেও ঝোপঝাড় ছিল, কেটেকুটে সাফ করে ফসল ফলাবার চেষ্টা হয়েছিল। জঙ্গলের মাটিতে চাষ আবাদ করা শক্ত। তবু মানুষ চেষ্টা করে। ওই যে জমি—ওখানে আমরা ফসল ফলাব।"

"ফার্মিং ?"

"ফার্মিং, মানে ধান চাষ নয়—" মহীতোষ বলল, "আমি ভেবেছি অনেকটা জমি থাকবে শুধু তিসি কলাই এই সব চাষের জন্যে, বাকিটাতে শাক-সবজি, এখানে অনেক রকম শাক-সবজি হতে পারে।"

নীলেন্দুর খুব জোরে হেসে উঠতে ইচ্ছে করছিল। মহীদা পাগল। একেবারে নির্বোধ। কোথাকার কোন রুক্ষ জমিতে চাষ আবাদের স্বপ্ন দেখছে! কি হবে শাক সবজি ফলিয়ে ? ব্যবসা করবে ?

কলকাতার সবজিবাজারের ফড়েদের আলু পটল বেচবে ?

হাত জোড় করে নীলেন্দু বলল, "দোহাই মহীদা, তুমি আমায় আর হাসিয়ো না। তোমার বুদ্ধির ওপর আমার যেটুকু ভরসা ছিল, তাও গেল।"

মহীতোষ বলল, "তুই হাসতে পারিস কিন্তু একটা কথা বল তো ? আমাদের দেশের কোটি কোটি মানুষ কি করে বেঁচে আছে ?"

নীলেন্দু মুখ ভরতি ধোঁয়া গিলে দু মুহূর্ত চুপ করে থাকল। পরে বলল, "বেঁচে আছে না নেই—সেটাই তো প্রথম প্রশ্ন। এ প্রশ্ন তুমি নিজেই করেছ একদিন।"

"এখন আমি সে তর্কের মধ্যে যাচ্ছি না। ওটা পরে হবে। আমি তোকে জিজ্ঞেস করছি—আমাদের দেশের শতকরা আশি নব্বুই ভাগ মানুষের বেঁচে থাকার অবলম্বন কি ? চাষবাস না কলকারখানা ?"

বিন্দুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ করল না নীলেন্দু, তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, "ছেলেবেলা থেকেই তো বইয়ে পড়ানো হয়েছে, ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ।"

"তুই অত তুচ্ছ করে ব্যাপারটা দেখিস না। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ মানুষই এখনও চাষ আবাদ করে পেটের অন্ন জোগায়।··· ধানচাল গমের কথা বাদ দে—ধর, আজ তোদের কলকাতা শহরের বাজারে বাজারে লক্ষ লক্ষ মানুষের আলু পটল কুমড়ো তরিতরকারি এ-সব কারা জোগাচ্ছে ? কাদের পরিশ্রমে তোরা খেতে পাচ্ছিস আমি সে-কথাও বলছি না। বলছি যারা খেতখামারে আলু, কচু, পটল, শাক-সবজি ফলাচ্ছে, তারা সেগুলো বাজারে বেচে নিজেদের ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা করছে। এটা তাদের জীবিকা, তাই কি নয় ?"

"বেশ তো, তাতে কি !"

"তাতে কথাটা দাঁড়াচ্ছে, ওই দশ বিঘে জমির ফসল যারা

ফলাবে, সেই ফলনের বিনিময়ে খুব কম করেও দশ-বিশ জন মানুষের গ্রাসাচ্ছাদন হবে।"

নীলেন্দু এবার হেসে ফেলল। বলল, "ও!"

মহীতোষ যেন সামান্য অপ্রতিভ হল। নীলেন্দুর দিকে তাকাল না, চোখ ফিরিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকল।

নীলেন্দু কেমন বিরক্ত বোধ করল, বলল, "তোমার মাথা সত্যি সত্যি খারাপ হয়ে গিয়েছে মহীদা; এসব ছেলেমানুষির কোনো মানে হয় না। আমি অন্তত বুঝতে পারছি না।"

মহীতোষ রাগ করল না, বিরক্তও হল না; বলল, "তোরা যে জিনিসগুলোকে তুচ্ছ ভাবিস, সেগুলো অত তুচ্ছ নয়। আমাদের দেশের রাজনীতি সমাজনীতি সব নীতির কাজ হল গোড়ার ব্যাপারটা অবজ্ঞা করা।"

ঠাট্টা করে নীলেন্দু বলল, "তুমি কি তা হলে গোড়ায় জল ঢালছ?"

কথাটা পুরোপুরি উপেক্ষা করে মহীতোষ বলল, "আমার সব কথা তো শুনলি না—আগে থেকেই চেঁচাতে শুরু করলি। নীলু, তোর স্বভাবটা পালটে যাচ্ছে, তুই একেবারে ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলির এম-এল-এ হয়ে যাচ্ছিস!" বলে মহীতোষ হেসে ফেলল. জোরেই।

নীলেন্দুও হাসল। কেমন এক বিরক্তির মধ্যে এই হাসি যেন অবস্থাটাকে সহনীয় করে তুলল। নীলেন্দু বলল, "বলো, তোমাব কথা শুনি—।"

মহীতোষ তার উদ্দেশ্যের কথা বলতে লাগল।

ওই যে দশ বিঘে মতন জমি—যাতে এক-আধ বছর চাষবাসের চেষ্টা করে কোনো সুফল পাওয়া যায় নি, ওই জমিটাকে মহীতোষ কাজে লাগাবে। কাজে লাগাবে ধান চাষ করে নয়, অন্য রকম ফসল ফলিয়ে। জমির মাটি যে-রকম তাতে তরিতরকারির ফসল হতে

পারে। জল কাছাকাছি পাওয়া যাবে। সামান্য দূরে একটা ঝিলের মতন আছে, প্রচণ্ড গ্রীষ্মে শুকিয়ে আসার মতন হলেও সারা বছরই তাতে অল্পস্বল্প জল থাকে। সেই জল বয়ে আনার জন্যে ছোট করে নালা কাটা শুরু করেছে মহীতোষ, ওই যে মাটির স্তূপ ওর গায়েই সেই ঝিল।

মহীতোষ বলল, ধানের জমি স্টেশনের পুব দিকে। ধানের জমি এখনও হাতে আসে নি। কথাবার্তা চলছে। শীঘ্রি হয়ত হাতে আসবে।

এ ছাড়া মহীতোষ একটা তাঁতঘর বসাবার ব্যবস্থা করছে। মোটামুটি কাজও এগিয়েছে খানিকটা। মাস দেড়েকের মধ্যে কাজ শুরু করতে পারবে বলে মনে হয়।

নীলেন্দু ব্যঙ্গ করে বলল, "একটা কুমোরপাড়া বসাবে না?"

মহীতোষ বলল, "বসাতাম যদি এখানে কুমোর থাকত। তবে ইটের ভাটিখানা বসাতে পারি। শুনেছি এখানে ইট করার সুযোগ রয়েছে।"

রোদ আরও গাঢ় তপ্ত হয়ে উঠেছিল। সামনের প্রান্তর যেন রঙ ধরার মতন দেখাচ্ছিল—উজ্জ্বল হলুদ। এক জোড়া পাখি উড়ে যাচ্ছিল। বাতাস রয়েছে। দিগন্তে কালচে রেখার মতন গাছপালার মাথায় আকাশ লুটিয়ে পড়েছে।

নীলেন্দুর ভাল লাগছিল না। মহীদা এতটা নির্বোধ হতে পারে তার জানা ছিল না আগে। এমনকি তার বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে করছিল না. কোনো মানুষ এই বয়েসে এমন একটা ছেলেখেলায় নামতে পারে।

যেন ক্লান্ত বিরক্ত হয়েই নীলেন্দু আবার একটা সিগারেট ধরাল। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বলল, "তুমি তা হলে এই সব করবে ঠিক করেছ?"

"হ্যাঁ।"

"এতে কি হবে ?"

"কিছু লোক খেতে পারবে।"

"তাই কি ?"

"তোর সন্দেহ হচ্ছে ? তা হলে জিজ্ঞেস করি, এখানকার লোকগুলো খায় কি ? কি খেয়ে তারা বেঁচে আছে ? এটা তোমাদের কলকাতা শহর নয় যে গভর্নমেণ্ট রেশন দিয়ে এদের বাচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। এখানে কোনো কারখানা নেই, কাজেই চাকরি-বাকরির কথা ওঠে না। জমি কুপিয়ে আর বাইরে গিয়ে দিন-মজুরি করে এদের জীবন কাটে।···আমি হিসেব করে দেখেছি, যদি আমার কাজকর্ম ঠিক ঠিক মতন চালাতে পারি—তাহলে এখানকাব পঁচিশ-ত্রিশটা পরিবার মোটামুটি খেতে পরতে পারবে।"

"তুমি কি পঁচিশ ত্রিশটা পরিবারকে মোটামুটি খাওয়ানো যথেষ্ট মনে করো ?"

"যথেষ্ট মনে করি না, নীলু। কিন্তু সমস্ত মানুষেরই সাধ্য আছে। আমার সাধ্যে এইটুকু কুলোতে পারে আপাতত। যদি বলিস আমি কি আরও বড় কিছুর কথা ভাবি না, তা হলে বলি, ভাবি। কিন্তু সে দিবাস্বপ্ন দেখে লাভ কি ? আমি যেটুকু করতে চাইছি তাতেই আমার অনেক টাকার দরকার। সেই টাকাব জন্যেই মরছি। এর বেশী এখন আর কিছু করার উপায় আমার নেই।"

নীলেন্দু সিগারেটের কোনো স্বাদ পেল না। মুখ থেকে ধোঁয়াটা ঠেলে বের করে দিল। পরে বলল, "তোমার এই সব কাজ কোনো কাজ নয়। বাস্তবিকপক্ষে তুমি কিছুই করছ না। করতেও পারবে না। মাসকয়েক আলু-বেগুনের চাষ নিয়ে থাকবে—তারপর ছেড়ে দেবে।"

মহীতোষ এবার যেন ক্ষুব্ধ হল। বলল, "কেন ?"

"কেন, সে-কথা আমায় জিজ্ঞেস করছ ! আশ্চর্য !"

"তবু শুনি—।"

"এ তোমার কাজ নয়, মহীদা। তুমি ভদ্র পরিবারের শিক্ষিত ছেলে, হয়ত তত বড়লোক নও, কিন্তু গরিব ঘরের ছেলেও নও। শহুরে মানুষ তুমি। চাষ আবাদ ফসলের তুমি কিছু জানো না, মাটিতে সোনা ফলানো তোমার কর্ম নয়। যদি তুমি চাষী পবিবারের ছেলে হতে আমি তোমায় বাহবা দিতাম। এটা তোমার খেয়াল।"

মহীতোষ বলল, "আমি তো বলি নি আমি নিজের হাতে চাষ কবছি। যারা এসব কাজ করত তারাই করবে।"

"তুমি তা হলে ফাইনান্স করছ ?"

"করছি। শুধু তাই নয়, ওদের সঙ্গেও থাকছি।"

"বাঃ! জমি তোমার, আশা করছি—জমি চাষের গরু, লাঙ্গল এসবও তোমার হবে। তাঁতঘরের তুমি মালিক হবে, যন্ত্রপাতির মালিকানাও তোমার থাকবে। তার মানে—তুমি এখানে জমি জায়গা তাঁতঘরের মালিকানা ভোগ করবে, আর কিছু লোক তোমার লাভের জন্যে খাটবে। এই তো ?"

মহীতোষ কিছুক্ষণ নীলেন্দুকে দেখল। যেন তার কোথায় ঘা লেগেছে। সামান্য গম্ভীর গলায় বলল, "না, আমি মালিকানা ভোগ করব না।"

নীলেন্দু তাকাল।

"দেবীর ওই বাড়ি, আর তার কিছু গচ্ছিত টাকার মালিকানাও আমার নয়, নীলু। আমার কোথাও কোনো মালিকানা নেই।... আমি যা করছি তার মালিকানা আমার সঙ্গে যারা থাকবে তাদের সকলেব। এটা আমার মুখের কথা নয়। আইনসঙ্গতভাবে সেই ব্যবস্থাই করা হচ্ছে।"

"টাকাটা তো তোমাদের ?"

"দেবীর কিছুটা, আমার যৎসামান্য।...আমাদের কলকাতাব পুরোনো বাড়ির আমার অংশটা পরিতোষ বেচে দিতে পারলে সেই টাকাটা আমি এই বাবদ ঢালব। টাকার আমার বড় দরকাব।"

মহীতোষ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

নীলেন্দু বলল, "তুমি বলতে চাইছ, মহীতোষ অ্যাণ্ড কোম্পানির ফার্মিং-এর ব্যাপারটা তুমি এখানকার গরিবগুর্বোদের দান করছ ?"

অসন্তুষ্ট হল মহীতোষ, বলল, "দান নয়, দায়। এই দায় ওদের সকলের। যেখানে নিজের বলে কিছু থাকে না সেখানে মানুষ মনের টান পায় না। মায়ায় জড়ায় না। যদি ওই জমি, ফসল, ওই তাঁত—সবই তার নিজের বলে মনে করে তা হলে সে নিজেকে কাজের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলবে। আমাদের দেশের মানুষের—বিশেষ করে যারা জমির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাদের শ্রমশক্তির কতটা ব্যয় হয় আর কতটা হয় না তুই জানিস ?"

নীলেন্দু অ-মনোযোগের গলায় বলল, "শুনেছি যেন কোথায় !"

"একটা মোটামুটি হিসেব, বছরের মধ্যে ছ-সাত মাস···। এই ছ-সাত মাস আমাদের দেশের গ্রামের মানুষ তার শ্রম-ক্ষমতার অপব্যয় করে। এই ক্ষতির পরিমাণ কত জানিস।"

নীলেন্দু মাথা নাড়ল। বলল, "মহীদা, তুমি আমায় কাগজের হিসেবের ফাঁদে ফেলো না। ওটা আমি বুঝি না। বুঝতেও চাই না।···আমি শুধু বুঝি, এই কাঠামোয় কিছু হবে না—হবার নয়।··· তোমার এই চেষ্টা আমার কাছে ছেলেখেলা ছাড়া কিছু মনে হচ্ছে না। আমাকে তুমি মাপ করো।"

মহীতোষ আর কিছু বলল না।

আরও সামান্য বসে থেকে গাছের ছায়া থেকে উঠে পড়ল দু'জনে। বাড়ির দিকে ফিরতে লাগল।

খানিকটা হেঁটে এসে নীলেন্দু যেন আপনমনে বলল, "মানুষ কেমন বদলে যায়। আমি স্বীকার করি, জীবনটা ছাঁচে ঢালা ধাতব পদার্থ নয়, তার নিজের একটা গতি আছে, আস্তে আস্তে নানা টানা-পোড়েনের মধ্যে দিয়ে তার অদলবদল ঘটে যায়। কিন্তু এ-রকমনাটকীয় বদল আমি দেখি নি। অন্তত তোমার বেলায় ভাবি নি, মহীদা।"

মহীতোষ কোনো জবাব দিল না।

"তুমি," নীলেন্দু মহীতোষকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "সেদিনও বড় বড় কথা বলতে। দেশ নিয়ে, দেশের মানুষ নিয়ে তোমার মাথা ব্যথার অন্ত ছিল না। গলায় তখন তোমার কি ঝাঁঝ, রক্ত যেন আগুন ছিল, বিপ্লব, রেভল্যুশান, এই অথারিটি, করাপ্টেড সিস্টেম—এর মধ্যে থেকে কি করে বেরিয়ে আসা যায় তার কথা বলতে। আর আজ তুমি জমিতে আলু বেগুন ঝিঙে ফলাবার কথা বলছ! আশ্চর্য!" বলতে বলতে নীলেন্দু কেমন ঘৃণার চোখে মহীতোষের দিকে তাকাল।

## ছয়

মহীতোষদের পরিবারের একটা ইতিহাস আছে। এ-রকম ইতিহাস যে কলকাতা শহরে বাঙালী পরিবারে আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না—তা অবশ্য নয়। বরং অজস্রই পাওয়া যাবে। তবু এই ইতিহাসের খানিকটা চমৎকারিত্ব রয়েছে।

মহীতোষের বাবা শিবপ্রসাদ ছিলেন কারবারী মানুষ। পুরোনো বাগমারির দিকে তাঁর কারখানা ছিল, পৈতৃক আমলের কারখানা, যেখানে নানা ধরনের রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হত। শিবপ্রসাদের বাবা যখন কারখানা খুলেছিলেন তখন বাঙালীদের মধ্যে ব্যবসায় নামার একটা হিড়িক পড়েছিল। চাকরির বাজারের মন্দা চলছিল বলেই শুধু নয়, বাণিজ্যে না নামলে বাঙালীর অন্ন জুটবে না—এই বিশ্বাসেই আবেগ এবং উচ্ছ্বাসের বশে রাতারাতি যারা নেমেছিল তাদের বেশীর ভাগই টিকতে পারে নি। শিবপ্রসাদের বাবা কিন্তু টিকে গিয়েছিলেন। তখন বাগমারির দিকে লোকালয় বলে বিশেষ কিছু ছিল না, পতিত জমি জলের দরে বিক্রি হত। অনেকটা জমিজমা ইজারা নিয়ে এক বন্ধুর পরামর্শে শিবপ্রসাদের বাবা তাঁর কেমিক্যালস্-এর কারখানা

খোলেন। বছর পনেরো পরিশ্রমও করেছিলেন প্রচুর। শেষের দিকে ভালো মতন অর্থ উপার্জনও করতে পেরেছিলেন। ব্যবসার যখন সুদিন তখন তিনি মারা যান। শিবপ্রসাদ বাবার ব্যবসায় মন দেবার পর প্রথম দিকে কোনো বাধা পান নি। তারপর একে একে নানা দিক থেকে ঝঞ্ঝাট এসে জুটতে লাগল। কারখানার নিজের জমি নিয়ে অদ্ভুত এক মামলায় জড়িয়ে পড়লেন, বাজারে প্রতিযোগিতা বেড়ে উঠতে লাগল, কারখানায় গণ্ডগোল অশান্তি। বিশ্বস্ত এক কর্মচারীও তাঁকে দেনায় ডুবিয়ে পালিয়ে গেল। কারখানা বেচে দিয়ে শিবপ্রসাদ বেলেঘাটার দিকে ব্যাটারী তৈরির কারখানা খুললেন। সেটা মোটামুটি ভালই চলতে লাগল।

শিবপ্রসাদ যখন বাগমারির কারখানা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত—তখন তাঁর প্রথমা স্ত্রী মারা যান। প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে শিবপ্রসাদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। ভাল না থাকার কারণ অবশ্য একাধিক। প্রথম কারণ, স্ত্রী তাঁকে সন্দেহ করত। শিবপ্রসাদ পরিশ্রমী পুরুষ হলেও তাঁর কিছু কিছু দুর্বলতা ছিল। দরজিপাড়ায় একটা বাড়িতে তাঁর যাতায়াত ছিল নিত্য, সেই বাড়ির এক থিয়েটার-করা মেয়ের তিনি ভরণ-পোষণ নির্বাহ করতেন। নিজের স্ত্রীকে শিবপ্রসাদ পছন্দ করতেন না। প্রথমত স্ত্রীর রূপের জন্যে, দ্বিতীয়ত তার মুখরা স্বভাবের জন্যে। মনে মনে শিবপ্রসাদের ভীষণ ক্ষোভ ছিল, বাবা কেমন করে এই মদ্দা চেহারার মেয়েটির সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিলেন। সম্ভবত অর্থের জন্যেই। তাঁর স্ত্রীর মুখশ্রী বলে কিছু ছিল না, শরীর স্বাস্থ্যেও মেয়েলী গড়নের অভাব ছিল প্রচুর, গায়ের রঙ ছিল খানিকটা ফরসা এই যা—। কিন্তু এমন মুখরা, জেদী, নির্বোধ মেয়েও সচারাচর দেখা যায় না। প্রথমা স্ত্রী মারা যাবার পর শিবপ্রসাদ যথার্থ ভাবে কোনো দুঃখ পান নি। বরং মুক্তিই অনুভব করেছিলেন। দ্বিতীয় বার বিয়ে করার সময় শিবপ্রসাদ নিজেই পাত্রী পছন্দ করেছিলেন। বাবা তখন জীবিত নেই। নিজের বয়েসের সঙ্গে মানানসই করে যাকে তিনি পছন্দ

করলেন, সেই মেয়েটি অসাধারণ সুন্দরী না হলেও চোখে ধরার মতন। দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়েও শিবপ্রসাদ সুখী হতে পারেন নি, কেননা দ্বিতীয় স্ত্রী ছিল অত্যন্ত চতুর, দাম্ভিক, বেপরোয়া। শিবপ্রসাদ পরে বুঝতে পারেন, তিনি ভুল করেছেন। আর এটাও ধরতে পারেন, তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী বাপের বাড়ির এক দূর আত্মীয়ের প্রতি আসক্ত। শিবপ্রসাদ নিজের চারিত্রিক দুর্বলতা শোধরাতে পারেন নি, কাজেই স্ত্রীর সঙ্গে কলহে জিততেও পারেন নি কখনো। দ্বিতীয় স্ত্রী মারাও গেল রহস্যজনক ভাবে। বাইরের রটনা আর যথার্থ ঘটনা এক নয়। পারিবারিক সম্মানের জন্যে শিবপ্রসাদ নানা জায়গায় ধরাধরি করে অর্থব্যয় করলেন, লোকে জানল—মেয়েলী কোনো মারাত্মক ব্যাধি এবং রক্তক্ষরণের জন্যে শিবপ্রসাদের স্ত্রী মারা গেছেন। শিবপ্রসাদও আর বেশীদিন বেঁচে থাকেন নি। হার্টের রোগে মারা যান।

মহীতোষ শিবপ্রসাদের প্রথমা স্ত্রীর সন্তান। দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান পরিতোষ। একটি মেয়ে মাঝখানে ভূমিষ্ঠ হলেও বাঁচে নি। কোনোই সন্দেহ নেই, শিবপ্রসাদ তাঁর প্রথমা স্ত্রীর সন্তানের ওপর নজর দেন নি। প্রয়োজন বোধ করেন নি বোধ হয়।—মহীতোষ বাল্যকাল থেকেই পিতার দৃষ্টির বাইরে বাইরে বেড়ে উঠেছে। সম্ভবত প্রথমা স্ত্রীর প্রতি শিবপ্রসাদের যে বিরাগ এবং ঘৃণা ছিল তার খানিকটা মহীতোষের ওপরেও পড়েছিল। তা ছাড়া শিবপ্রসাদ পুত্রপালনকে কর্তব্য বলে মনে করতেন না। যদি বা কখনও তাঁর মনে কর্তব্য-জ্ঞান জন্মে থাকে—স্ত্রীর ভয়ে মুখ খুলতে সাহস করেন নি। এ-রকম দু-একটা নজির না আছে এমনও নয়। প্রথমা স্ত্রী মারা যাবার পর দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে শিবপ্রসাদ প্রথম দিকে এতোই আতিশয্য করেছেন যে, মহীতোষ তাঁর লক্ষে পড়ে নি। বরং পরিতোষের জন্মের পর সে শিবপ্রসাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পরে আর নয়।

বাল্যকাল থেকেই মহীতোষ অযত্ন-বর্ধিত। যেন বাগানের বহু

গাছপালার মধ্যে সে শখের কিংবা যত্নের কোনো গাছ নয়, নিতান্তই কেমন করে জন্মে গেছে, এবং প্রতিটি ঋতুতে নিজের মতন বেড়ে উঠেছে। কেউ তার দিকে চোখ দেয় নি, দেবার কথা মনে করে নি। একেবারে অনাবশ্যক যেন। সুখের কথা মহীতোষ অযত্ন-বর্ধিত হলেও অত্যাচারিত হয় নি। খানিকটা পিসিমার জন্যে, আর বাকিটা বোধ হয় এই কারণে যে, সংসারের কেউই সেটা প্রয়োজন মনে করে নি। মহীতোষের বিমাতা—মানে পরিতোষের মা-ও মহীতোষকে চোখের কাঁটা মনে করত না। বরং বিমাতা হয়েও কখনও কখনও মহীতোষকে আদর যত্ন করেছে ছোট মা।

মহীতোষ বাল্যকাল থেকেই দেখেছে—তাদের পরিবারটি ছিল বিচিত্র। মা, বাবা, পিসিমা, ছেলেরা এই নিয়ে সংসার। কিন্তু এদের বাদ দিয়ে আরও জনা সাতেক পুষ্যি ছিল বাবার। চাকর-বাকর না ধরেই। কারখানার যোগেশবাবু আর সদানন্দ, দেশের কোন জ্ঞাতি সম্পর্কে এক বুড়ো মামা, পিসিমার শ্বশুরবাড়ির কোন ভাগ্যহীনা ভাসুরঝি—এই রকম। বাড়ির কর্তা এ-সব ব্যাপারে কথা বলতেন না, ধরেই নিয়েছিলেন সকলেই তাঁর সংসারের অন্তর্ভুক্ত।

শিবপ্রসাদ মারা যাবার পর যোগেশবাবু—মহীতোষরা যাঁকে যোগেশকাকা বলত, বছর দুই ব্যবসাটাকে ধরে রেখেছিলেন। তারপর আর পারলেন না। মহীতোষ ততদিনে বড় হয়ে গেছে—পরিতোষও সাবালক। মহীতোষ কোনো দিনই বাবার ব্যবসা সম্পর্কে আগ্রহী ছিল না বিন্দুমাত্র। পরিতোষ বরাবরই যন্ত্রপাতি নিয়ে মাথা ঘামাত. তার শখও ছিল মেশিন টুলস-এর বিক্রিবাটা নিয়ে থাকে। ফলে বেলেঘাটার কারখানার পুঁজিপাটা গুটিয়ে এনে পরিতোষ তার নিজের ব্যবসায় নেমে পড়ল। সংসারের বাড়তি লোকগুলোও ততদিনে হয় মারা গেছে, না হয় চলে গেছে। পিসিমাও মারা গেল।

একটা কথা এখানে বলতে হয়। মহীতোষ আর পরিতোষের

মধ্যে বয়েসের তফাত বছর সাতেকের। মহীতোষের বছর পাঁচ বয়েসে মা মারা যায়। বাবা পুরো বছরটাও অপেক্ষা করেন নি, দ্বিতীয়বার বিয়ে করে আনেন, পরিতোষ জন্মায় পরের বছর। দুই ভাইয়ের মধ্যে বয়েসের ব্যবধানও মহীতোষকে পরবর্তীকালে অভিভাবক হবার সুযোগ দেয় নি। সে সুযোগ মহীতোষ চায় নি, তার ইচ্ছাও ছিল না, তাছাড়া বাড়ির সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগ মহীতোষ অনুভব করত না। পরিতোষের সঙ্গে তার সদ্ভাব কিন্তু ছিল, হয়ত ওই একটিমাত্র জায়গায় সে কোনো পারিবারিক বন্ধন অনুভব করত। পরিতোষও কোনো দুর্বোধ্য কারণে মহীতোষের প্রতি আন্তরিক প্রীতি অনুভব করেছে বরাবর। একটা সময় গিয়েছে যখন পরিতোষ তার দাদার নানা রকম কাণ্ডকারখানায় বিরক্ত এবং অস্বস্তি বোধ করেছে। আতঙ্কিতও হয়েছে। নিষেধ করেছে। কিন্তু মহীতোষকে বদলাতে পারে নি।

এখন দুই ভাই যে যার মতন, যে যার পথে, স্বাধীন ভাবে চলেছে। হয়ত পরিতোষ দাদার কোনো কোনো ব্যাপারে অখুশী। কিন্তু বিরোধ বাধাবার মতি তার হয় নি।

সেদিন দুপুর বেলায় মহীতোষ যেন কিছু মনে করে দেবযানীর ঘরে গিয়ে দেখল, দেবযানী বিছানায় শুয়ে বই পড়ছে।

মহীতোষকে দেখে মুখের পাশ থেকে বই সরিয়ে দেবযানী তাকাল।

মহীতোষ কাছাকাছি এসে কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। অন্যমনস্কভাবে দেখতে লাগল দেবযানীকে। তারপর বলল, "তোমার কাছে খাম আছে?"

"না," দেবযানী বলল, বলে খানিকটা যেন অবাক চোখে মহীতোষকে দেখতে লাগল। খাম-টাম, পোস্টকার্ডের সঙ্গে তার সম্পর্ক কবে চুকে গেছে, কলকাতা ছেড়ে চলে আসার পর সে একটা

কি দুটো চিঠি লিখেছিল, আর এখানে এসে—কখনো-সখনো আশিসকে সাংসারিক প্রয়োজনে কিছু লিখতে হয়, লেখার সময় তাকেই মহীতোষের কাছে খাম পোস্টকার্ড চেয়ে নিতে হয় বরাবর। দেবযানীর কাছে কিছু থাকে না।

মহীতোষ বলল, "পরিতোষকে একটা চিঠি দেব ভাবছিলাম।"

"তোমার কাছে নেই?"

"ফুরিয়ে গেছে।"

বই রেখে দেবযানী উঠে বসল। মহীতোষ তখনও দাঁড়িয়ে।

"পরিতোষ যে কি করছে আমি বুঝতে পারছি না," মহীতোষ সামান্য দুশ্চিন্তার মুখ করে বলল, "কিছুই জানাচ্ছে না।"

বিস্তারিত করে বলার কিছু ছিল না দেবযানীকে, সে জানে মহীতোষ কি কারণে উদ্বেগ বোধ করে। টাকা। মহীতোষ টাকার জন্যে রীতিমত ভাবনায় পড়েছে।

কি মনে করে মহীতোষ দেবযানীর বিছানার একপাশে বসল। "সেই কবে একটা চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল, ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে—তারপর আর কোনো চিঠিপত্র নেই। শরীরটরীর খারাপ করল কি না কে জানে?"

দেবযানী বলল, "ওর বউয়ের শরীর খারাপ হয়েছে হয়ত।"

মহীতোষ দেবযানীর চোখের দিকে তাকাল, এক পলক, তারপর চোখ ফিরিয়ে নিল।

দেবযানীর কলকাতায় থাকার সময়েই পরিতোষ বিয়ে করেছিল। মহীতোষ বড় ভাই, কাজেই ছোট ভাইয়ের বিয়েতে তাকে সামাজিক ভাবে অভিভাবকের ভূমিকা নিতে হয়েছিল। এ-রকম কোনো ভূমিকায় তাকে মানায় না, তবু মহীতোষ কোনো রকমে তার কর্তব্য পালন করেছিল। দেবযানী পরিতোষদের বিয়েতে ও-বাড়ি গিয়েছিল নিমন্ত্রিত হিসেবেই। তার আগেও সে পরিতোষকে দেখেছে। পরিচয় আছে। পরিতোষের বউকে অবশ্য বউভাতের দিনই প্রথম

দেখল। ভালই দেখতে। পরিতোষের জানাশোনা মেয়ে। বয়েস কম, পুরোপুরি সাবালিকাও হয়ত নয়, অন্তত চেহারার মধ্যে সেটা ফুটে ওঠে নি তখনও। 'খুবই ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ দেখাচ্ছিল। পরিতোষের বউয়ের নাম এষা, ডাক নাম রান্নু।

কিছুদিন—তা মাসখানেকের ওপর হতে চলল—পরিতোষ তার দাদাকে যে চিঠি দিয়েছিল সেই চিঠির মধ্যে, এবং রান্নু ছোট করে দেবযানীকে যে চিঠি লিখেছিল তার মধ্যে—দেবযানী একটা আভাস পেয়েছিল রান্নুর শরীর-স্বাস্থ্যের। ওর বাচ্চাকাচ্চা হবে মনে হয়েছিল।

মহীতোষ বলল, "টাকার জন্যে কাজকর্মের দেরি হয়ে যাচ্ছে বড়।"

দেবযানী ততক্ষণে পা গুটিয়ে হাঁটু মুড়ে বসেছে। তার বসার এই ভঙ্গি তাকে চমৎকার মানায়। বয়েস হওয়া সত্ত্বেও শরীর অতটা ভারী হয়ে ওঠে নি যে গড়নের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে, হাত পা এখনও যথেষ্ট স্বাভাবিক দেবযানীর, মেদসঞ্চিত নয়, কোমর ভেঙে বসতে তার অসুবিধে হয় না। পেছনের দিকটা ভারী হলেও পিঠের সঙ্গে মানানসই করে বাঁকানো। মাথায় সামান্য লম্বা বলেই দেবযানীর যেখানে যেটুকু স্থূলতা তা যেন দৃষ্টিকটু হয়ে চোখে পড়ে না।

"তুমি যে কি ভাব—" দেবযানী বলল, "বাড়ি বিক্রি অত তাড়াতাড়ি হয় নাকি? তা ছাড়া তোমাদের পুরোনো বাড়ির একটা দিক ওভাবে বেচা কি সহজ?"

"কি জানি! কলকাতায় বাড়ি বেচাকেনা শুনেছি রাতারাতি হয়।"

"ও-সব শোনা কথা, কাজের কথা নয়।"

মহীতোষ কেমন অধীর ভাবে বলল, "পরিতোষ নিজেই নিয়ে নিক না। আমি তো তোকে লিখেছি।"

দেবযানী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না, পরে বলল, "পরিতোষ ব্যবসাপত্র করে। অতগুলো টাকা সে লুট করে এদিকে চালবে কেন?

তাতে তার অসুবিধে। তা ছাড়া অনেকেই নিজের ভাই কি দাদার সম্পত্তির অংশ কিনতে চায় না।

মহীতোষ কথাগুলো শুনল কি শুনল না, বলল, "দেখি, তাগাদা দিয়ে আবার একটা চিঠি লিখি···।"

দেবযানী কোনো জবাব দিল না।

শীতের এই মাঝ দুপুর একেবারে নিস্তব্ধ। দেবযানীর ঘরের জানলায় পরদার মতন এক টুকরো কাপড় ঝুলছে, মোটা কাপড়, গভীর হলুদ রঙের, বাইরে রোদ ক্রমশই যেন তাত হারিয়ে শুধু জ্বলজ্বল করছে, বাতাস বইছিল শীতের। কাক চড়ুই—কিছুই ডাকছে না। একেবারে স্তব্ধ যেন চতুর্দিক।

মহীতোষ বলল, "নীলু কি বলছিল জান?"

তাকাল দেবযানী। নীলেন্দু কি বলতে পারে অনুমান করা তার অসাধ্য নয়। তবু মহীতোষ কি বলতে চাইছে জানার সাধারণ আগ্রহ বোধ করল দেবযানী।

সামান্য চুপ করে থেকে মহীতোষ বলল, "ও বলছিল, আমি ভদ্রলোকের ছেলে শহুরে মানুষ—এখানে এসে যা করছি এর কোনো মানে হয় না। আমি ছেলেমানুষি করছি। আমার এ খেয়াল দু দিনেই ভেঙে যাবে।"

দেবযানী তেমন একটা অখুশী হল না। নীলেন্দুর মতন অতটা নিঃসন্দেহ সে এখন আর হতে পারে না। আগে হয়েছিল। মহীতোষের এই অদ্ভুত খেয়াল কতটা সাংসারিক সে বিষয়ে প্রচুর সন্দেহ ছিল তার। বারণও করেছে সাধ্য মতন। মহীতোষ শোনে নি। যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছে—পরিশ্রম আর আন্তরিকতা থাকলে না হবার কারণ কি? আমাদের স্বভাব হল, মানুষকে সব সময়েই সীমাবদ্ধ করে দেখা, তার সম্ভাবনাকে আগে থেকেই আংশিক-ভাবে বিচার করে নেওয়া। এটা ঠিক নয়, মানুষ তার পুরোনো অভ্যস্ত পারিপার্শ্বিককে বদলে নিতে পারে, তার অভ্যাস পালটেও

যায়। মানুষকে যদি পুরোপুরি তার বিশেষ সমাজের, শিক্ষার, রুচির, কর্মক্ষমতার দাস করে দেখা যায় তবে তার সম্ভাবনাকে মূল্য দেওয়া হয় না। প্রয়োজনে যে মানুষ সমস্ত রকম অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে তার প্রমাণ অজস্র প্রমাণ সংসারের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে।

দেবযানী যে মহীতোষের সঙ্গে কোমর বেঁধে তর্ক না করেছে এমন নয়, কিন্তু সে বুঝে নিয়েছিল ব্যাপারটা তর্ক করে মীমাংসা করা যাবে না। জেদের সঙ্গে তর্ক চলে না। সঙ্কল্পের সঙ্গেও নয়।

নিজের অনিচ্ছা আপত্তি যতই থাকুক শেষ পর্যন্ত দেবযানী অবশ্য মহীতোষের সাধ বাসনায় বাধা দেয় নি। বরং মহীতোষ যে ভাবে দিন দিন নিজেকে তার অবাস্তব ভাবনা চিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলছিল তাতে মনে হল; ব্যাপারটা হালকা করে দেখার নয়। দেবযানীও যেন ক্রমশ মহীতোষের দিকে ঢলে পড়তে লাগল।

ঝাড়গ্রামে থাকতেই মহীতোষ আশিসকে পেয়ে গিয়েছিল। বড় ভাল ছেলে আশিস। বয়স কম। মাথার মধ্যে পোকা নড়লে সেও মহীতোষের চেয়ে কিছু কম যায় না। দুজনে মিলে কত রকম কথা হত, কাগজপত্র টেনে নিয়ে লেখালিখি হিসেবপত্র চলত, আশিসকে সঙ্গে করে ঝাড়গ্রামের চারদিকের জলমাটির খবর করে বেড়িয়েছে মহীতোষ, কোথায় কোন ফসল ফলে, কতটা ফলে, জলের অভাব, মাটির গুণ-অগুণ। খরচখরচার রাশি রাশি হিসেব লিখেছে। আশিস ঝাড়গ্রামের ছেলে, তার অনেক কিছুই নখদর্পণে, মুখ বুজে কাজও করতে পারে। তা ছাড়া, এই অল্প বয়েসে যা হয় এরা—মনে মনে স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে, সেই ধরনের মন আশিসের। আজকালকার শহুরে, বিশেষ করে কলকাতার ছেলেদের চেয়ে অন্য ধাতের ছেলে আশিস, জীবনে বড় বড় আদর্শ-টাদর্শ নিয়ে মুগ্ধ হতে ভালবাসে।

যাক্ গে, মহীতোষ আশিসকে পেয়ে যেন আরও জোর পেল। তার উদ্যম গেল বেড়ে। কাগজ কলম থেকে হাতেনাতে নিজের কাজকর্ম

নিয়ে যেতে উঠল মহীতোষ। দেবযানী ততদিনে মেনে নিয়েছে, মহীতোষ যা করছে, এ-ছাড়া তার আর কিছু করার ছিল না।

তবু মনে মনে একটা ক্ষোভ বা প্রতিবাদ ছিল বই কি! মুখে দেবযানী কিছু আর বলত না, কিন্তু মনের দ্বিধা সে কেমন করে কাটাবে।

নীলেন্দু যা বলেছে মহীতোষের যে সেটা পছন্দ হয় নি দেবযানী বুঝতে পারল। বুঝতে পেরেও সে অখুশী হল না, কেননা নীলেন্দুর কথার সঙ্গে যেন এখনও দেবযানীর খানিকটা সায় রয়েছে।

বিছানা থেকে নেমে পড়ল দেবযানী।

মহীতোষ বলল, "পরিতোষ যতক্ষণ না টাকা পাঠাচ্ছে আমি ধানের জমিগুলো কিনতে পারছি না। কথা বলে রেখেছি, কিন্তু বেশীদিন শুধু কথা দিয়ে ফেলে রাখলে চলবে না। মহিন্দর বলছিল, তাড়াতাড়ি না করলে হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। রজনী মাহাতোর বিঘে পাঁচেক জমি রয়েছে ওর গায়ে, ওটাও পেতে পারতাম যদি আগের জমিটা কেনা হয়ে যেত।"

জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল দেবযানী। বাইরের নিস্তেজ রোদ দেখতে লাগল। পেয়ারা গাছের সরু ডাল কাঁপছে বাতাসে।

"আশিসকে বললে পারতে, ব্যাংক থেকে টাকা তোলার ব্যবস্থা করত," দেবযানী মৃদু গলায় বলল।

মাথা নাড়ল মহীতোষ। "তোমার টাকায় আর হাত দেব না।"

"এখন তো দরকার।"

"তা হোক।"

"আমার টাকায় তোমার এত আপত্তি কেন?"

"আপত্তি কোথায়!...যা হয়েছে সবই তোমার টাকায়। তোমার টাকাই নিয়েছি। আমার নিজের তো পুরো দু হাজার টাকাও ছিল না।"

দেবযানী মুখ ফেরাল না। কোথায় বুঝি একটা ঘূর্ণি উঠেছিল

তার দমকা বাতাসে উড়ে যাচ্ছিল ধুলো, দু-একটা শুকনো পাতা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। শেষে দেবযানী বলল, "পরিতোষ বোধ হয় তোমার অংশ বেচতে রাজী হবে না।"

"কেন?"

"কি জানি, আমার কেমন মনে হচ্ছে..."

"ওর রাজী না হবার কারণ কি! পুরোনো বাড়িতে সে থাকে না। ওই ছোট গলির মধ্যে বাড়ি, তার যা চেহারা না বলাই ভাল। পরিতোষ নিজে কোনোদিন ও বাড়িতে থাকবে না। ভাঙাচোরা পুরোনো বাড়ি বেচতে তার আপত্তি হবে কেন? নীচে দু-এক ঘর ভাড়াটে আর ছোট মুদির দোকান, মুড়ি বাতাসা বিক্রি হয়।" মহীতোষ এমন ভাবে বলল কথাটা যেন কলকাতায় রাতারাতি বাড়িটাড়ি বেচে ফেলা যায়। পরিতোষ ইচ্ছে করলে অনায়াসেই কাজটা সেরে ফেলতে পারত।

দেবযানী চুপ করে থাকল। মহীতোষের বৈষয়িক বুদ্ধি সম্পর্কে তার কোনো আস্থা নেই। বরং দেবযানী মেয়ে হয়েও কিছু কিছু বুঝতে পারে। নিজেদের বাড়িতে সে দাদাদের মুখে এসব অনেক শুনেছে। তার নিজের ধারণা, যত সহজ ভাবছে মহীতোষ কাজটা অত সহজ নয়।

মহীতোষ বলল, "তুমি যা বলছ তা হতে পারে। পরিতোষ হয়ত রান্নুর জন্যে ঝঞ্ঝাটে রয়েছে। একটা চিঠি লেখা এমনিতেও দরকার।"

ঘরের বাইরে লাটুর গলা শোনা গেল। দুপুরের কাজকর্ম সেরে রাখছে একে একে। খানিকক্ষণ আগে কুয়া থেকে জল তুলে কলঘরের ড্রাম ভরে রাখছিল। আজ হাটবার। স্টেশনের পশ্চিম দিকে আমবাগানে হাট বসে। দুপুরেই কেনাবেচা শেষ হয়ে যায়। বিকেলের গোড়ায় ব্যাপারীরা ফিরতে শুরু করে। শীতের দিন। বিকেলের মধ্যে কেনাবেচা সেরে ফেলতে না পারলে দু-চার ক্রোশ এমনকি আরও দূর জায়গায় ফেরা মুশকিল। পায়ে হেঁটেই ফেরে বেশীর ভাগ ব্যাপারী,

এক-আধটা গরুর গাড়িও থাকে। বিকেলের প্যাসেঞ্জার গাড়িতেও ফিরে যায় কেউ কেউ।

লাটু হাটে যাবে। টাকা পয়সা চাইতে এসেছে।

দেবযানী ঘরের বাইরে গেল।

মহীতোষ সামান্য বসে থেকে উঠে পড়ল। কেমন এক অশান্তি বোধ করছিল সে। দেবযানীর কাছে আরও কিছু বলার ছিল, বলা হল না। অথচ মহীতোষ নিজেই বুঝতে পারছিল না—কি বলবে সে। নীলেন্দু কি তার মন ভেঙে দেবার চেষ্টা করছে? হয়ত করছে। মহীতোষকে হতাশ করে অবশ্য কোনো লাভ নেই নীলেন্দুর। তা ছাড়া, অন্যের কথায় ভেঙে পড়ার মতন মানুষ মহীতোষ নয়।

আসলে ব্যাপারটা অন্যরকম। মহীতোষ যে বাস্তবিক কিছু করতে যাচ্ছে—এটা নীলেন্দুকে বোঝানো গেল না। খানিকটা ফাঁকা মাঠ দেখিয়ে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করাই ভুল। যদি নীলেন্দু দেখত—ওই মাঠে কিছু ফসল ফলে আছে তবে হয়ত বুঝতে পারত মহীতোষ যা বলছে সেটা মুখের কথা নয়। তাঁতঘরের ব্যাপারটাও ওই রকম। তাঁত বসাবার বাড়িটা টিনের চালা দিয়ে তৈরী হয়েছে মাত্র, তাঁত বসে নি এখনও। বসতে বসতে আর মাস দেড়-দুই। হাতে চালানো তাঁত। কলের জন্যে আগাম দেওয়া হয়েছে, এখনও পাওয়া যায় নি। ধানের জমি তো এ-যাবৎ কেনাই হল না। কথাবার্তা হয়ে রয়েছে মাত্র। যদি নীলেন্দু দেখত, মাঠে মাঠে সবুজ ফসল ফলে আছে, যদি দেখত তাঁতকলে কাজ হচ্ছে, সবজিক্ষেতে নানা রকম সবজি ফলেছে—সে হয়ত বুঝতে পারত মহীতোষ অলস হয়ে বসে নেই। কাজকর্ম করছে। কিন্তু নীলেন্দুকে দেখানোর মতন আপাতত কিছু নেই মহীতোষের। কিছু না দেখলে মানুষ কেন বিশ্বাস করবে? নীলেন্দুর সন্দেহ স্বাভাবিক।

বাইরের বারান্দায় লাটু একটা ছোটখাট ঝুড়ি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে। দেবযানী বলে দিচ্ছে কি কি আনতে হবে হাট থেকে।

মহীতোষ বলল, "নীলুর জন্যে ডিমটিম আনতে বলো। আমিষ ছাড়া ও কি খেতে পারবে?"

দেবযানী টাকা আনতে ঘরে যাচ্ছিল, কথাটা শুনল; কিছু বলল না।

বারান্দার জাফরি খুলে মহীতোষ বাইরে বেরিয়ে গেল। গাছতলায় গিয়ে বসে থাকবে। অনেক সময় তার এই রকমই হয়। মন চঞ্চল হয়ে পড়লে, কিংবা কোনো অস্বস্তি বোধ করলে সে সকাল কিংবা দুপুরে গাছতলায় গিয়ে বসে থাকে। নানা রকম কথা ভাবে।

অভ্যেসটা প্রায় ছেলেবেলার। ছেলেবেলায় মহীতোষ বাড়িতে একা একাই থাকত। মা মারা যাবার আগে মার ঘরেই তার থাকার ব্যবস্থা ছিল। বাবা পাশের বড় ঘরে থাকত। রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে মহীতোষ অনেক সময় মাকে বিছানার পাশে দেখতে পেত না। ঘর অন্ধকার থাকত। দরজা পুরোপুরি ভেজানোও থাকত না। মহীতোষ বুঝতে পারত মা বাবার ঘরে গিয়েছে। মা যে বাবার ঘরে গিয়েছে এটা বোঝার কোনো অসুবিধে ছিল না। কেননা মা বাবার ঘরে গেলেই গলা পাওয়া যেত, বাবার সঙ্গে মা ঝগড়া করছে, মাঝরাতেও ঝগড়া থামতে চাইত না। খুবই আশ্চর্য্য, বিছানার পাশে মা না থাকলেও মহীতোষের এমন কিছু ভয় করত না। বরং একা একা জড়সড় হয়ে শুয়ে থাকতেই তার ভাল লাগত। মার চেঁচামেচি, কান্নাকাটি তার পছন্দ হত না।

মা মারা যাবার পর মহীতোষ গেল পিসিমার ঘরে। পিসিমার ঘর ছিল অন্য দিকে, বাবার ঘরের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। পিসিমার ঘরে আলাদা ছোট বিছানা ছিল মহীতোষের। সে একলা শুয়ে থাকত, আপন মনে কত কি ভাবত, ছেলেমানুষ যেমন ভাবে। পিসিমার ঘরে শোওয়া বসা করলেও নীচের তলায় ছিল মহীতোষের পড়ার ঘর। পুরোনো কিছু আসবাবপত্র, নোনাধরা

দেওয়াল, খানিকটা ঝাপসা মতন আলো, বাবার ফেলে রাখা একরাশ কাগজপত্র—ওর মধ্যে মহীতোষের সকাল-সন্ধ্যে কাটত। তার যখনই খারাপ লাগত, কিংবা ওই ঘরের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠত—সে বাইরে এসে বাতাবি লেবুর গাছের তলায় গিয়ে বসে থাকত চুপ করে।

তাদের কলকাতার মলঙ্গা লেনের বাড়িতে দু-চারটে বাড়তি জিনিস থেকে গিয়েছিল। মহীতোষ শুনেছে, ঠাকুরদার যখন অবস্থা খুব ভাল যাচ্ছিল তখন মলঙ্গা লেনের পুরানো অথচ নিরিবিলি এই মুখটায় ঠাকুরদা বাড়িটা সস্তায় কিনে নেয়। বাড়িটার মালিকানা নিয়ে সামান্য জটিলতা ছিল, ঠাকুরদা সেটা মিটিয়ে ফেলেছিল বুদ্ধি করে। পুরোনো বাড়ি ছেড়ে তখনই এ-বাড়িতে চলে আসে ঠাকুরদা। পুরোনো বাড়িতে অসুবিধে ছিল অনেক, সাবেক কালের বাড়ি। গলিটা হাত পাঁচেকও চওড়া নয় বোধ হয়, আলো বাতাসের অভাব, তার ওপর বাড়ির গায়ে এক বস্তি দিন দিন বেড়ে উঠতে লাগল। নতুন বাড়িতে এসে ঠাকুরদা অবশ্য বাড়ি মেরামতির জন্যে আর পয়সা খরচ করে নি। করব করছি করেই একদিন কিছু না করে মারা গেল।

মলঙ্গা লেনের বাড়ির উত্তর ঘেঁষে, পেছনের দিকেই প্রায়, অল্প ফাঁকা জমি ছিল। সেই জমিতে নানা আবর্জনার স্তূপের পাশে একটা বাতাবি লেবুর গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকত, গাছটায় কোনোদিন একটা লেবু ফলতে কেউ চোখে দেখে নি; গাছটার গায়ে গায়ে তুলসীর ঝোপ ছিল, আর আবর্জনার স্তূপের মধ্যে ঘাসের ডগা, সন্ধ্যামণি ফুলের গাছ, এমনকি গাঁদা ফুলের গাছও দেখা যেত। বাড়ির বাইরে, গলিটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, বাড়ির গায়ে গায়ে একটা ছোট্ট মন্দির ছিল শিবের। শিবরাত্রের দিন খুব ভিড় হত মন্দিরে।

মহীতোষ ছেলেবেলা থেকেই বাতাবি-তলার দিকটা যেমন পছন্দ করত, সেই রকম তার শিবমন্দিরের দিকেও টান দিল। ছোট্ট মন্দির, ভেতরে দশ হাত জায়গাও আছে কি না সন্দেহ, সাদা ঠাণ্ডা মেঝেতে

বেলপাতাটাতা পড়ে থাকত, বুড়ো পুরুতঠাকুর সব সময়ে মন্দিরে থাকত না, লোহার শিক পরানো দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাইরে চলে যেত। মহীতোষ মাঝে মাঝেই শিবমন্দিরের সিঁড়িতে গিয়ে বসে থাকত চুপচাপ। নিরিবিলি গলিতে লোকজন গেলে দেখত, রিকশা চলে যাবার সময় তাকিয়ে থাকত। তার ভাল লাগত মন্দিরের সিঁড়িতে বসে থাকতে। পুরুতমশাই মন্দিরে থাকলে মহীতোষের সঙ্গে গল্প করতেন, নানারকম গল্প।

মহীতোষ যখন আরও বড় হয়ে উঠল, বাবা বেঁচে রয়েছে, নতুন মা-ও মারা গেল, পরিতোষও বেড়ে উঠেছে, তখন বাড়িতে মহীতোষ নিজের থাকার জায়গা একেবারে আলাদা করে নিয়েছিল। সে নীচের তলায় থাকত। তার ঘর আলাদা। বসবার জায়গাও আলাদা। ওপরের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই প্রায় ছিল না। খাওয়ার সময় যা ওপরে উঠতে হত মহীতোষকে। তাও রাত্রের দিকে অর্ধেক দিন বাড়ির ঠাকুর নীচে এসে মহীতোষের খাবার রেখে যেত।

বাবা মারা যাবার পরও মহীতোষ যেমন-কে-তেমনই থাকল। সংসারের কোনো ব্যাপারেই তার গা ছিল না। যোগেশকাকাই সব দেখাশোনা করতেন আর সামলাতেন। সদানন্দ ছিল। তারপর যোগেশকাকা যখন হাল ছাড়লেন তখন পরিতোষ সংসারের ভার ঘাড়ে করে নিল।

মহীতোষ আর পরিতোষের মধ্যে সবচেয়ে বড় তফাত এইখানে। মহীতোষ যা পারে নি চেষ্টাও করে নি কোনোদিন, পরিতোষ তা পারল। পারল, কারণ—পরিতোষের স্বভাবটাই ছিল আলাদা। সে ছেলেবেলা থেকেই বংশের গুণ পেয়েছিল, বাপ-ঠাকুরদার মতন টাকা পয়সা, হিসেব, কোথায় সাংসারিক লাভক্ষতি সেটা বুঝতে শিখে গিয়েছিল। লেখাপড়ায় পরিতোষের মাথা তেমন খোলে নি। সাধারণ ছেলের মতন স্কুল কলেজ টপকে গেছে। কলেজ টপকে যাবার আগে থেকেই সে বাবার ব্যবসাপত্রের পড়তি অবস্থা দেখছিল। বাবা

মারা যাবার পর—যোগেশকাকার আমলেই পরিতোষ কাকার সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে শুরু করে। কোনো রকমে বি কম পরীক্ষাটা দিয়েই পরিতোষ ব্যবসা নিয়ে পড়ল। এ-ব্যাপারে তার মাথা পরিষ্কার, ঝোঁকও যথেষ্ট। যোগেশকাকা বেঁচে থাকতে থাকতেই পরিতোষ পাকা হয়ে গিয়েছিল, তার দূরদৃষ্টি খুলে গিয়েছিল।

পরিতোষ যখন সংসারের ভার নিল তখন বাড়িতে লোকজন কমে গেছে। বাবা, যোগেশকাকা, পিসিমা—কেউ আর বেঁচে নেই। আশ্রিতদের মধ্যেও বেশীর ভাগই নেই। শুধু সদানন্দ আর সম্পর্কে এক মাসি ছিল। পরিতোষ কাউকে তাড়ায় নি। বরং সদানন্দকে বুড়ো বয়সে সংসারের দেখাশোনার কর্তা করে দিয়েছিল।

দাদার সঙ্গে পরিতোষের সম্পর্ক ছিল পরিষ্কার। মহীতোষকে সে ভালবাসত, অনেক ব্যাপারে পছন্দ করত, কিন্তু দাদার বোধবুদ্ধি সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। পুরোপুরি বন্ধুত্বের পর্যায় না পড়লেও খানিকটা বন্ধুর মতন এক অন্তরঙ্গতা ছিল তার দাদার সঙ্গে। ঠাট্টা তামাশা করত, কিন্তু দু-জনের সম্পর্কের ব্যবধানটা সে বজায় রাখত হিসেব করে।

অনেক মজার মজার ঘটনা দুই ভাইয়ের মধ্যে ঘটে গেছে। আবার এক আধবার মনোমালিন্যও যে না ঘটেছে এমন নয়। কিন্তু তাতে কিছু ক্ষতি হয় নি কারও পক্ষে।

মহীতোষ যখন নীলেন্দুদের সঙ্গে বাড়াবাড়ি ভাবে জড়িয়ে পড়েছে তখন একদিন দুই ভাইয়ে রীতিমত বচসা হয়েছিল। পরিতোষ দাদার এই ব্যাপারটা মনে মনে কোনোদিন পছন্দ করে নি। শেষের দিকে তার ভয়ও হয়েছিল।

ভয় হবারই কথা। কলকাতায় তখন রোজই খুনোখুনি চলছে। কলকাতার বাইরেও। কাগজে যেসব খবর থাকে তার দিকে চোখ রাখলেই আতঙ্ক হয়, আর যেসব খবর থাকে না—যার সংখ্যা অনেক বেশী—সে সব খবরের কিছু কিছু কানে এলে মনে হয় গোটা পশ্চিম

বাংলাতেই একটা নৈরাজ্য চলেছে। মানুষের জীবন কতটুকু নিরাপদ সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। এমনকি এ-কথাও মনে হয়, যা ঘটে যাচ্ছে তার সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্কই নেই। মানুষকে আতঙ্কিত, সন্ত্রস্ত, বিহ্বল করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য এই খুনোখুনির মধ্যে থাকতে পারে না।

মহীতোষ এসময় মাঝে মাঝেই বাড়িতে থাকত না। কোথায় থাকত তাও বোঝা যেত না। বর্ধমানের দিকে একটা কলেজে সে পড়াত। আসা-যাওয়ার অসুবিধের জন্যে কলেজের টিচার্স কোয়ার্টার্সে থাকত, কিন্তু ছুটিছাটায় কলকাতায় এসেও বাড়িতে সব সময় মুখ দেখাত না। অন্য কোথাও থেকে যেত। পরিতোষ এটা পছন্দ করত না। দাদার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবার ইচ্ছে তার ছিল না। তা বলে নিরীহ, শান্তশিষ্ট, মার্জিত, সহৃদয়, নরম স্বভাবের মানুষ কতকগুলি নির্বোধ, উন্মত্ত, হিংস্র প্রকৃতির ছেলের পাল্লায় গিয়ে পড়বে, রাতারাতি বিপ্লবী হয়ে ছেলে খেপাবে, তার পারিবারিক সম্পর্ক নষ্ট করে গোপনে কলকাতায় আসা-যাওয়া করবে কেন? পরিতোষ ক্রমশই অসন্তুষ্ট, ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। তখনই একদিন দুই ভাইয়ে বিশ্রী রকম বচসা হয়ে যায়।

পরিতোষ রাগ করে বলেছিল, 'তোমাদের পলিটিকস্ আমি বুঝি না। তোমাকে আমি চিনি। তুমি যদি এই ভাবে দিন কাটাও আমার সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।'

জবাবে মহীতোষ বলেছিল, 'না থাকলে থাকবে না। আমার সঙ্গে এ-বাড়ির কারই বা সম্পর্ক ছিল যে তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছ।'

পরিতোষ আর কিছু বলে নি। অত্যন্ত আহত হয়েছিল সন্দেহ নেই।

পরে অবশ্য মহীতোষ নিজের ব্যবহারের জন্যে লজ্জিত হয়েছে। এই রূঢ়তা তার নিজেরই খারাপ লেগেছে। পরিতোষকে এ ধরনের কথা বলা তার উচিত হয় নি। কেননা, কথাটা শুনতে যত ছোট তার

অর্থ তত ছোট নয়।

পরের বার বর্ধমান থেকে ফিরে এসে মহীতোষ যেন ভাইকে খুশী করতে বাড়িতেই থেকে গেল দিন দুই। সোমবার আবার ফিরে গেল কাজের জায়গায়।

মহীতোষ বাইরে গাছতলায় এসে দাঁড়াল। শীতের আকাশ এই শেষ দুপুরে কেমন যেন স্তিমিত দেখাচ্ছে। সূর্য সামান্য ধোঁয়াটে। ছেঁড়া ছেঁড়া কিছু মেঘ জমেছে। দমকা বাতাসে ছোট ছোট ঘূর্ণি উড়ছে, শুকনো পাতা আর ধুলো উড়িয়ে। পরিতোষকে চিঠি লেখার জন্যে মহীতোষ খুবই ব্যাকুল হয়ে উঠছিল।

## সাত

চার পাঁচটা দিন কেটে যাবার পর নীলেন্দু বলল, "মহীদা, আমি কাল-পরশু কলকাতায় ফিরে যাব।"

মহীতোষ বলল, "থাক না আরও কয়েকটা দিন, কলকাতায় ফিরে তোর কাজটা কিসের!"

নীলেন্দু সাধারণভাবে হাসল।

দেবযানী বলল, "এই চুপচাপ ফাঁকা জায়গা ওর কতদিন আর ভাল লাগবে! তাই না নীলু?"

মাথা নেড়ে নীলেন্দু বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ দেবীদি, এখানে আমার আর ভাল লাগছে না। তোমাদের দেখতে এসেছিলুম, দেখা হয়ে গেল, আবার কি! বলে নীলেন্দু সামান্য ব্যঙ্গ, খানিকটা বা অবজ্ঞার মুখ করে হাসল।

মহীতোষ লক্ষ করেছিল কিনা কে জানে দেবযানী হাসিটা লক্ষ করল। নীলেন্দু দেবযানীর বিছানায় আধ-শোয়া ভঙ্গিতে বসে, বিছানার

মাথার দিকে দেবযানী। মহীতোষ পুরোনো একটা বেতের চেয়ারে বসে, ছোট মতন এক চৌকিতে তার পা। জানলা বন্ধ। ঘরের দরজা পুরোপুরি খোলা নয়। লোহার ঝাঁঝরির মধ্যে কাঠ-কয়লার আগুন ছিল, ক্রমশ নিবে আসছে। বিছানার তলায় প্রায় মহীতোষের পায়ের কাছে ঝাঁঝরিটা। ঘরের মধ্যে মোটামুটি আরাম পাওয়া যাচ্ছিল। সামান্য তাপও অনুভব করা যায় আগুনের। লণ্ঠনটা উঁচু জায়গায় রাখা ; কারও মুখে সরাসরি আলো পড়ছে না, খুব স্পষ্ট করে মুখও দেখা যায় না হয়ত। তবু দেবযানী নীলেন্দুর হাসি লক্ষ করতে পারল।

দেবযানী কি মনে করে বলল, "আমাদের দেখে তোমার যে ভাল লাগে নি বুঝতেই পারছি—'তোমায় দেখে আমাদের কিন্তু ভালই লেগেছে।"

নীলেন্দু ঘাড় বেঁকিয়ে দেবযানীর দিকে তাকাল। বলল, "ওটা তোমার মনের কথা নয়, দেবীদি।"

"নয় ?" দেবযানী যেন অবাক হল।

"আমার একটু ভুল হয়েছিল, শুধরে নিচ্ছি। তোমরা আমায় দেখে হয়ত খুশী হতে চেয়েছিলে কিন্তু পুরোপুরি খুশী হও নি। তুমি অন্তত প্রথম দুটো দিন আমায় বড় সন্দেহ করেছ।"

দেবযানী আহত হল, কথার জবাব দিল না।

মহীতোষ বলল, "তুই আবার একবার আসিস।"

"কেন ?"

সামান্য সঙ্কুচিত হয়ে মহীতোষ ধীরে ধীরে বলল, "এবারে এসে তুই কিছু দেখতে পেলি না। তোর ভালও লাগল না। চোখে কিছু না দেখা পর্যন্ত কারও কোনো জিনিসই বিশ্বাস হয় না, তুই আমার চেষ্টার কিছু দেখতে পেলি না। বিশ্বাসও করলি না, আমি কিছু করার চেষ্টা করছি। পরে যদি আসিস তোর ভুল কিছুটা ভাঙবে।"

নীলেন্দু সোজা হয়ে বসল। বলল, "আমার আসবার আর কোনো

ইচ্ছে নেই, মহীদা। এসে যা দেখব, আমি আগে থেকেই তা দেখতে পাচ্ছি।"

মহীতোষ প্রথমে কথা বলল না, তারপর বলল, "কি দেখতে পাচ্ছিস ?"

নীলেন্দু অনুভব করছিল, দেবীদি তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে দেবযানীর দিকে তাকাল না। মহীতোষকেই লক্ষ করে বলল, "তোমার ধানের জমি, তোমার তাঁতকল, ওই দশ বিঘে তিসি কলাই আর শাক-সবজির ক্ষেত হয় ফাঁকা পড়ে আছে, মাঠে গরুছাগল চরছে ; আর না হয় তুমি উদ্যোগী পুরুষের মতন ধান ফলিয়ে, কলাই-কলাইয়ের চাষ করে, শাক-সবজি চালান দিয়ে, গামছা চাদর বেচে দিব্যি গ্রাম্য ধনী হয়ে বসে আছ। তোমার কাছে সারাদিন ফড়ের ভিড়।...এই দুটোর বেশী আর কি হবে, হয় মন্দ না হয় ভাল। আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই তোমাদের ব্যবসায়িক ভালমন্দ দেখার।" বলে নীলেন্দু থামল একটু। তার চোখমুখ বিরক্ত দেখাচ্ছিল। গলার স্বরও কেমন যেন কর্কশ শোনাল। সম্ভবত সামান্য উত্তেজিত হয়েই নীলেন্দু একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল।

মহীতোষ বা দেবযানী কথা বলল না। নীলেন্দুর দিকে তাকিয়ে থাকল। আরও যেন কিছু বলবে নীলেন্দু, সেই রকম মনে হওয়ায় তারা অপেক্ষা করছিল।

নীলেন্দু আবার বলল, "ছ'মাস এক বছর পরে তোমাদের কি হল জানবার কোনো উৎসাহ সত্যিই আমার নেই। হয়ত তোমরা খুব সুখেই থাকবে, দেবীদির কোলে শুয়ে তোমাদের ফুটফুটে বাচ্চা দুধ খাবে, বারান্দায় কাঁথা শুকোবে, কিন্তু এ-সব জেনে বা দেখে আমার কোন্ পরমার্থ লাভ হবে মহীদা ? কি আমার যায় আসে তোমাদের সুখ দেখে ?"

দেবযানী কি বলতে যাচ্ছিল তার আগেই মহীতোষ বলল, "দুঃখটাও দেখে যেতে পারিস।" তার বলার মধ্যে কোনো বিদ্রূপ ছিল না।

জোরে মাথা নাড়ল নীলেন্দু। বলল, "দুঃখ সওয়ার নমুনা তো আগে থেকেই দেখাচ্ছ। বাড়ি কিনেছ, জমি কিনেছ, আরও কিনবে। তার ওপর তাঁতকল বসাচ্ছ নিজের পয়সায়। এ-সব শখের দুঃখ আমায় দেখিয়ো না মহীদা। আমি দেখেছি। শুনেছি তোমাদের গান্ধী ট্রেনে থার্ড ক্লাসে যেতেন। কিন্তু তাঁর যাবার আগে যে সমস্ত প্লাটফর্ম রাতারাতি ঝকঝকে তকতকে করে রাখা হত, ট্রেনের বগিতে দশবার ঝাড়মোছ হত এ-সব খবর কে রাখে! তুমি আমি কোন্ থার্ড ক্লাসে যাই?"

মহীতোষ বলল, "এখানে এই কথাটা কেমন করে আসে, নীলু?"

"কেন আসবে না?...এ-সব শখের দুঃখ দেখিয়ে কি লাভ!"

মহীতোষ প্রতিবাদের মতন মাথা নেড়ে বলল, "নীলু, আমি ধরে নিলাম, গান্ধীজীর জন্যে যা করা হত সেটা সকলের জন্যে করা হত না। কিন্তু তুই বল, তোদের কোন্ ক্ষুদে নেতাও সাধারণ মানুষের চেয়ে সুখ সুবিধে বেশী আদায় না করে? কোন্ নেতাকে তুই রেশনের দোকানে লাইন দিতে দেখেছিস? একটা নেতার নাম বল যাকে তুই বাস স্ট্যাণ্ডে বাস ধরার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিস? আমি অন্তত চোখে দেখি নি।"

নীলেন্দু কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ থেমে গেল। সম্ভবত সে কোনো নেতার নাম মনে আনার চেষ্টা করছিল, পারছিল না। তার মনে পড়ছিল না।

মহীতোষ বলল, "এটা তর্কের ব্যাপার নয়, নীলু। নেতাটেতা হলে তোদের খাতিরের মাত্রাটা নিজের থেকেই বেড়ে যায়। একবার আমাদের কলেজের ব্যাপারে তোদের এক নামকরা বামপন্থী নেতাকে কলকাতা থেকে ছেলেরা নিয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোক নিজের গাড়িতে বর্ধমান গিয়েছিলেন, কিন্তু যাবার আগে ছেলেদের কাছ থেকে পেট্রলের টাকা আগাম নিয়ে নিয়েছিলেন...। এই রকমই হয়। নেতারা তো নেতা, জনতা নন।"

নীলেন্দু বিদ্রূপ করে বলল, "তোমার এই ব্যাপারটাও কি সেই রকম নয়? তুমি কোন্ স্বার্থে এই জনসেবা দেখাতে এসেছ?"

মহীতোষ যেন সামান্য বিমূঢ় হল, বলল, "আমি কিছু বলব না, নালু। এখন নয়। আমার বলার মুখ নেই। ভবিষ্যতে যদি কিছু করতে পারি, তুই নিজের চোখে দেখে তার বিচার করবি।"

মাথা নেড়ে নীলেন্দু বলল, "আমি আর আসব না। তুমি ফকির হলে, নাকি রাজা হলে—সে বিচার করার জন্যে আমার আসার কোনো দরকার নেই।"

"এ তোর রাগের কথা।"

"হ্যাঁ, রাগের কথা। ঘৃণার কথা।...তোমাদের সম্পর্কে আমার ধারণা আর বদলাবে না।"

দেবযানী অস্বস্তি বোধ করছিল। এই বচসা তার ভাল লাগছিল না। নীলেন্দুর কথাবার্তাও পছন্দ করছিল না দেবযানী। বরং বিরক্ত হয়ে উঠছিল।

দেবযানী বলল, "তোমার ধারণাটা কেমন হল শুনতে পারি?"

নীলেন্দু দেবযানীর দিকে তাকাল। "সে তো আগেই বলেছি..."

"আগে বলেছ? কি বলেছ?"

"বলেছি যে, তোমরা সুবিধেবাদী, ভীতু, এস্কেপিস্ট্। তোমরা গা বাঁচাতে পালিয়ে এসেছ। সোজা বাংলা ভাষায় একে পালানো বলে।"

দেবযানী বিরক্তির শব্দ করল।

ডান হাত উঠিয়ে নীলেন্দু যেন দেবযানীকে সামান্য অপেক্ষা করতে বলল। তারপর ব্যঙ্গের গলায় বলল, "বিয়ে-থা ঘরসংসার করে ছেলেমেয়ে নিয়ে তোমরা সুখে থাকতে চাও। লক্ষ লক্ষ লোক যেমন থাকে। অবশ্য সুখে থাকে কিনা আমি জানি না। তবে থাকে।... যাক্ গে, এটা তোমরা কলকাতায় থেকেও করতে পারতে। কেউ তোমাদের গলা কেটে নিত না। অনেকেই তো করেছে এ-রকম, গা

বাঁচিয়ে চলে গেছে। তোমরা এত ভীতু যে তাতেও তোমাদের সাহস হল না। পালিয়ে এলে। ভাবলে আমরা তোমাদের ক্ষতি করব।"

দেবযানী যেন আর সহ্য করতে পারল না, বলল, "করতেও তো পারতে।...তা ছাড়া, আমরা আমাদের মতন কোথাও যেতে পারব না, কিছু করতে পারব না, এমন দাবিও বা তোমাদের থাকবে কেন?"

নীলেন্দু দেবযানীর দিকে প্রায় স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে বলল, "না দেবীদি, আমাদের কোনো দাবি নেই।"

দেবযানী চুপ করে গেল। নীলেন্দুর দৃষ্টিতে, তার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে—দেবযানী যেন বাধ্য হয়েই নিজের রাশ টেনে ধরল। তার মন শান্ত হল না, রাগও জুড়লো না, তবু আর কথা বলতে পারল না।

শেষে দেবযানী ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মহীতোষ কিছুক্ষণ ধরে চুপচাপ ছিল। তার ভাল লাগছিল না। হয়তো কোনো দুঃখ বোধ করছিল। চুপচাপ আরও একটু বসে থেকে মহীতোষ বলল, "নীলু, একটা কথা বলব?"

"বলো।"

"মানুষ অনেক ভুল করে, নিজের জীবনেও করে আবার বহু লোকের জীবনের ব্যাপারেও করে। ছোটখাটো ভুল শুধরে নেওয়া যায়, তাতে মারাত্মক কোনো ক্ষতি হয়ত হয় না। বড় বড় ভুল, বিশেষ করে সেটা যদি বহু লোকের ভাগ্য নিয়ে হয়, তবে তার পরিণাম আর সামলানো যায় না...আমি যদি ভুল করি, তার বোঝা নিজের বয়ে বেড়াতে চাই, সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার হবে। কিন্তু এমন ভুল আমি করতে চাই না যার সঙ্গে অনেকের ভাগ্য জড়ানো। অন্যদের জীবন নিয়ে খেলা করার অধিকার আমার নেই।"

নীলেন্দু চুপচাপ কথা শুনছিল মহীতোষের। জবাব দিল না।

এলোমেলো ভাবে তাকাল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, তারপর বলল, "মহীদা, দু বছর আগে তোমার মুখের কথার সঙ্গে আজকের কথার কত তফাত !"

মহীতোষ কথা বলল না। তার চোখ সামান্য ঝাপসা দেখাল, যেন দৃষ্টিতে উজ্জ্বলতা নেই। কোনো রকম অন্যমনস্কতার দরুনও এটা হতে পারে। প্রায় চোখে পড়ে না, পাতলা বিষণ্ণতাও যেন মণির গায়ে জড়িয়ে থাকল।

নীলেন্দু তার সিগারেটের প্যাকেট টানল আবার, বিছানার এক-পাশে ছুঁড়ে দিল। বলল, "তখন তোমার কথা শুনে মনে হত, তোমার সঙ্গে নরেনবাবুদের কথার মিল আছে।"

মহীতোষ যেন কোনো পাপকর্মের গ্লানি বোধ করছিল। নীলেন্দুর দিকে তাকাল, চোখ নামাল। বলল, "আমার ভুল হয়েছিল !"

"একথা আজকে বলার কোনো মানে হয় না, মহীদা। সেদিন তুমি আমার মতন অনেক ছেলের মাথা চিবিয়ে খেয়েছ।"

মহীতোষ প্রতিবাদ করল না, শুধু বলল, "আমি তা চাই নি ...।"

"না চাইলেও যা ঘটেছে তা অস্বীকার করতে পারবে না।"

মহীতোষ বলল, "আমি কোনোদিন কোনো দলে থাকি নি। আমার কোনো অফিসিয়াল ফাংশান ছিল না। নরেনবাবুদের পার্টির আমি হয়ত সিমপ্যাথাইজার ছিলাম। তাঁদের ভাবনা চিন্তা যে আমার সব সময় ভাল লাগত তা নয়, তবু প্রথম দিকে নিশ্চয় লাগত। পরে আমি নানা ব্যাপারে নরেনবাবুর সঙ্গে তর্ক করেছি। তিনি আমায় গ্রাহ্য করতেন না। বিশ্বাসও করতেন না। আমায় কোনো দিনই ওঁদের দলের বড়দের কারুর কাছে নিয়ে যান নি, বা বলেনও নি তাঁদের পার্টির ভেতরে আসতে। আমি নরেনবাবুদের কথাবার্তা কিছু কিছু মানতাম--কিন্তু পুরোটা নয়—শুধু এই কারণেই তিনি আমাকে খানিকটা তফাত রেখে আগাগোড়া লক্ষ করে গেছেন আমি কতটা তাঁদের কাছে আসব। যতটা এসেছি ততটা তাঁরা নিয়ে নিজেদের

কাজে লাগিয়েছেন, বাকিটা নেন নি।"

নীলেন্দু অদ্ভুতভাবে হেসে উঠে বলল, "তুমি নরেনবাবুদের বিপ্লবের ফড়ে ছিলে?"

মহীতোষ আহত হল না, বলল, "তাই ছিলাম। আমাকে দালালও বলতে পারিস্।···কিন্তু আমার কাছে যারা আসত আমি তাদের কোনো দিনই বলি নি, তোমরা নরেনবাবুদের দলে ভিড়ে যাও। যারা গেছে তারা নিজের ইচ্ছেয় গেছে, আমার কথায় নয়।"

নীলেন্দু সিগারেটের প্যাকেটটা আবার টেনে নিল। বলল, "তুমি যতই অস্বীকার করো, তোমার তখনকার কথাবার্তা, চালচলন, ব্যবহার বলত, তুমি নরেনবাবুর সঙ্গে আছ।"

মাথা নাড়ল মহীতোষ। "কেন? আমার কাছে যারা আসত তাদের কাছে আমি নরেনবাবুদের অনেক কাজের সমালোচনাও করেছি আর দেখেছি, সেই সমালোচনাটা যথাসময়ে নরেনবাবুর কানে উঠেছে। এ কথাটা কি প্রমাণ করে নীলু? প্রমাণ করে, আমার কাছে যারা আসত তাদের কেউ কেউ নরেনবাবুদের দলে যাতায়াত করত। তাই কি নয়? আমায় এমনভাব দেখাত যেন আমি বিশ্বাসের যোগ্য নই।"

নীলেন্দু একটা সিগারেট ধরাল। বলল, "তোমায় বিশ্বাস করা মুশকিল ছিল।"

"জানি।"

"তুমি নরেনবাবুদের কাজকর্ম অপছন্দ করতে।"

"করতাম।··· যদি কেউ আমাদের দেশের দুঃখদুর্দশা, বেকারি, দীন দশার কথা বলে আমি কেন মিছেমিছি তার প্রতিবাদ করব। কেউ যদি বলে, আমাদের মাথার ওপর বসে যারা রাজত্ব চালাচ্ছে তারা অপদার্থ অজ্ঞ তাতে আমার আপত্তি করার কিছু নেই। এ দেশে কেমন করে কালো টাকার পাহাড় জমছে, সুখসুবিধে মাত্র ক'জন ভোগ করছে, আর কোটি কোটি মানুষ কী অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে—

তা বোঝার জন্যে ছুটে বেড়াবার দরকারও করে না। কিন্তু আমায় কেউ যদি বলে, এসো—এই দুঃখদুর্দশা দূর করার জন্যে আমরা নৃশংস হই, রক্তপাত করে আতঙ্ক ছড়িয়ে বেড়াই—তা হলে আমার আপত্তি আছে। আমি নৃশংসতা বিশ্বাস করি না।"

নীলেন্দু বাধা দিয়ে বলল, "তুমি একতরফা নৃশংসতা দেখছ! যারা আমাদের নৃশংস করে তুলেছে তাদের ব্যাপারটা দেখছ না। তারা কি কম নৃশংস? ওই লোকগুলো আমাদের কি দিয়েছে মহীদা? খাবার দিয়েছে? মাথা গোঁজার জায়গা করে দিয়েছে? অসুখ করলে থাকবার হাসপাতাল দিয়েছে? চোরাই আর চোলাই শিক্ষা ছাড়া ভাল কিছু শিখিয়েছে? ...তুমি ওদের কথা বলো না। আমাদের দেশ বলে এটা আজও চলে যাচ্ছে, অন্য দেশ হলে চলত না।"

মহীতোষ বলল, "অন্য দেশের কথা থাক্, অন্য দেশে কি হয়েছে তার বারো আনাই আমরা জানি না। হয়ত চার আনা জানি, তাও বই পড়ে, নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে নয়। যে মানুষ নিয়ে তোর এত দুঃখ সেই মানুষের জীবনকে মরা কুকুর বেড়ালের মতন অপ্রয়োজনীয় মনে করে অনেক নরককাণ্ডও যে অন্য দেশে করা হয়েছে তাও তো দেখা যায়।...তবু আমি তোর কথা মানি। আমি স্বীকার করি, এ দেশে যা চলছে তার বারো আনা অন্যায়; আমি এই শাসনের গুণগান করতে চাইছি না। কিন্তু ভোট করে কিংবা খুনোখুনি করে যে দেশের চেহারা পালটে দেওয়া যাবে—এ আমি আর বিশ্বাস করি না।"

"তুমি কি বিশ্বাস করো? তোমার কি ধারণা এই গেঁয়ো জায়গায় বসে বসে খানিকটা চাষবাস করলেই দেশের সব দুঃখ ঘুচে যাবে?"

মহীতোষ রাগ করল না; বলল, "দেশের দুঃখ ঘোচাবার কথা আমি আর ভাবি না। ও-সব বৃহৎ কর্ম আমার জন্যে নয়। এক সময়ে মনে হয়েছিল, যারা ওই বৃহৎ কর্ম করার জন্যে দল বাঁধছে তাদের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখি। পরে আমার সে ইচ্ছে নষ্ট হল।" মহীতোষ থামল, মনে হল সে বলার কথা হঠাৎ সংক্ষেপ করে

নিল। শেষে বলল, "আমি খুব ছোট করে কিছু করতে চাইছি। এটা হয়ত আমার সাধ্যে কুলোবে। দশ-পনেরোটা পরিবারকেও যদি আমি খেয়ে পরে বেঁচে থাকার মতন সুযোগ করে দিতে পারি আমার কাছে তাই যথেষ্ট।"

নীলেন্দু বেঁকা স্বরে বলল, "তোমার যা যুক্তি তাতে তো মনে হয় কলকারখানার যত মালিক সবাই তোমার দলে। তারাও তো হাজার লোককে চাকরি দিয়ে রেখেছে, তাতে রাম শ্যামের পরিবার প্রতিপালনও হচ্ছে।"

"তা তো হচ্ছেই। তবে আমি তো কলকারখানার মালিক নই, আর আমার উদ্দেশ্যও টাকা খাটিয়ে লাভ তুলে নেওয়া নয়।"

নীলেন্দুর আর ভাল লাগছিল না। বিরক্তি বোধ করছিল। মহীদার কথাবার্তাগুলো একেবারে ছেলেমানুষের মতন। অর্থহীন।

হাই তুলে নীলেন্দু বলল, "আমি কালই চলে যাব ভাবছি। বেলা দশটার গাড়িতে।"

মহীতোষ তাকিয়ে থাকল। "কালকেই ?"

"হ্যাঁ ; কালই।"

মহীতোষ আর কিছু বলল ন

বিছানার ওপর থেকে নেমে পড়ল নীলেন্দু। "দেবীদি কোথায় গেল ?"

"আছে এদিকে কোথাও ?"

নীলেন্দু হেসে বলল, "দেবীদির সঙ্গে একটু গল্প করি।"

বাইরে এসে দেবযানীকে ডাকল নীলেন্দু।

মহীতোষের ঘর থেকে সাড়া দিল দেবযানী।

নীলেন্দু বলল, "একবার আমার ঘরে আসবে ?"

বাইরে এসে দাঁড়াল দেবযানী।

নীলেন্দু বলল, "আমার ঘরে চলো, গল্প করব।"

দেবযানী বলল, "গল্প না ঝগড়া ?"

হাসল নীলেন্দু। "না না ঝগড়া নয়। গল্প! তোমার দিব্যি।"

"তুমি যাও, আমি আসছি।"

শীতের জন্যে নীলেন্দু কম্বল চাপা দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। আজ সারা দিন শীতের বাতাসের সঙ্গে কেমন একটা বাদলার গন্ধ মেশানো ছিল। সকালের রোদ পরিষ্কার থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘোলাটে হয়ে গেল। আকাশ মাঝে মাঝে মেঘলা হয়ে বিকেল থেকে এই বাদলা বাতাস বইতে লাগল। শীতটাও অসহ্য হয়ে উঠল।

আজ নীলেন্দু কোথাও বেরোয় নি। বাড়ির আশেপাশে পায়চারি করেছে। দু-চার ফোঁটা বৃষ্টিও গায়ে পড়েছিল আচমকা। কে জানে রাত্রে বৃষ্টি নামবে কিনা!

দেবযানী ঘরে এসে দেখল, নীলেন্দু শুয়ে আছে। বলল, "শুয়ে পড়লে যে?"

"এমনি। শীত লাগছে।...এখন কটা বাজল?"

"রাত হয় নি। আটটা হবে।"

"এসব জায়গায় সময়টা যেন বোঝাই যায় না...দেবীদি, তুমি আমার এখানে এসে বসো," বলে নীলেন্দু তার পাশে বিছানার একটা জায়গা দেখাল।

দেবযানী নীলেন্দুর বিছানায় গিয়ে বসল। মুখোমুখি।

নীলেন্দু হেসে বলল, "পা দুটো তুলে দাও না, এই ঠাণ্ডায় পা ঢেকে বসলে আরাম পাবে।"

দেবযানী পা তুলে বসার জায়গা দেখল না। সরু তক্তপোশ, নীলেন্দু কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে আছে। বলল, "ঠিক আছে, তুমি শোও...।"

নীলেন্দু যতটা সম্ভব সরে জায়গা দিতে দিতে বলল, "তোমার পা আমি বুকেও রাখতে পারি দেবীদি; নাও, অনেক জায়গা করে দিয়েছি, পা দুটো কম্বলে ঢাকা দিয়ে বসো।"

দেবযানী আপত্তি করল। নীলেন্দু শুনল না। অগত্যা দেবযানীকে পা বিছানার ওপর তুলে কম্বল চাপা দিয়ে বসতে হল।

নীলেন্দু বলল, "আমি কাল সকালে ফিরব। দশটার ট্রেনে।"

"কাল?"

"কালকেই ফিরব। কলকাতায় আমার একটা দরকারী কাজ রয়েছে।"

দেবযানী নীলেন্দুর চোখে চোখ রেখে দু পলক তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, "তুমি সত্যি সত্যিই আর কখনো আসবে না?"

"না," মাথা নাড়ল নীলেন্দু। তারপর বলল, "তখন যা বলেছি তার জন্যে রাগ করো না।"

"তা না হয় হল, কিন্তু তুমি আমাদের ওপর এত রাগ করছ কেন? আমরা তো কোনো অন্যায় করি নি ভাই।"

নীলেন্দু সহজ স্বচ্ছ চোখে দেবযানীকে দেখতে দেখতে বলল, "হয়ত করো নি। ওসব কথা আর তুলো না; ভাল লাগছে না।"

দেবযানীর চোখ সামান্য বিষণ্ণ হল। তারও ভাল লাগছিল না একই কথা বার বার বলতে। চুপ করে থাকল।

নীলেন্দুই বলল, "দেবীদি, আমার সঙ্গে একদিন তুমি খোলামেলা কথা বলতে, এমনকি সেসব কথাও যা মেয়েরা নিজেদের বন্ধুকেও বলে না। তুমি আজও কি আমার সঙ্গে সেইভাবে কথা বলতে পারবে?"

দেবযানী ভ্রু কুঁচকে আড় চোখে নীলেন্দুকে লক্ষ করল। বুঝতে পারল না, এ কথা বলার কি অর্থ! বলল, "তোমার কি মনে হয়?"

"একটু সন্দেহ হচ্ছে...।"

"সন্দেহের দরকার নেই, বলো।"

নীলেন্দু হাত দুটো মাথার তলায় রাখল, বালিশের দু পাশে কনুই। বলল, "তুমি আর মহীদা আলাদা ঘরে থাকো কেন?"

দেবযানী বুঝতে পারে নি নীলেন্দু এ-রকম একটা প্রশ্ন করবে।

ইতস্তত করল। বলল, "আমি ভেবেছিলাম, এটা তুমি প্রথম দিনেই জিজ্ঞেস করে বসবে।"

"ইচ্ছে করেই করি নি।"

"তোমার মহীদা কি বলল?"

"মহীদার কাছে জানতে চাই নি। তোমায় জিজ্ঞেস করছি।"

দেবযানী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তোমার মহীদা এটা পছন্দ করে। তা ছাড়া এ বাড়িতে তিনটে ঘর, দুটো ঘর ফাঁকা রেখে লাভ কি!"

নীলেন্দু অসঙ্কোচে দেবযানীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, "ফাঁকা রাখার কথা বলছ, না ফাঁকি রাখার কথা বলছ?"

"মানে?"

"তোমরা কি সত্যিই স্বামী-স্ত্রী হয়েছ? না স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করছ?"

দেবযানী নীলেন্দুর চোখে চোখে তাকাল না, অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, "না, স্বামী-স্ত্রী।"

"তুমি না বলেছিলে কোনো অনুষ্ঠান হয় নি?"

"অনুষ্ঠান আচার বলতে যা বোঝায় তা হয় নি। ঝাড়গ্রামে থাকার সময় আমরা রেজিস্ট্রি করেছি।"

"তুমি সিঁদুর পরো কি পরো না—বোঝা যায় না।"

দেবযানী নীলেন্দুর ঠাট্টা বুঝতে পারল। সিঁদুর সে পরে, তবে অনিয়মিত, একদিন যদি বা পরে পাঁচ-সাত দিন আর পরে না। মোটা করে সিঁদুর পরতে তার কোনোদিনই ইচ্ছে হয় নি, ওটা তার ভাল লাগে না, নিতান্তই যেন কোন সংস্কারবশে বা নেহাত মন খুঁতখুঁত করবে বলে মাঝে মাঝে একটু ছোঁয়া দিয়ে রাখে সিঁদুরের। তা ছাড়া, সিঁদুর তার সয় না, মাথায় দিলেই সিঁথির চারপাশে ঘামাচির দানার মতন ঘা ফুটে ওঠে, জ্বালা করে, চুলকোয়। এক একজন মানুষের শরীরে এক একটা জিনিস সয় না, কেন সয় না ভগবানই জানেন।

দেবযানী সিঁদুরের ব্যাপারে তাই সাবধানী।

দেবযানী হালকা করে হেসে বলল, "কলকাতা থেকে তুমি একটা ভাল সিঁদুর পাঠিয়ে দিয়ো, পরব।"

"আলতা লাগবে না? যদি বলো তাও এক শিশি পাঠাতে পারি।"

দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

হাসি থামলে নীলেন্দু আবার বলল, "আমার আগের কথাটার জবাব কিন্তু তুমি এখনও দাও নি, দেবীদি। তোমরা স্বামী-স্ত্রী—কিন্তু এভাবে আলাদা ঘরে থাকো কেন?"

দেবযানী বিব্রত এবং অস্বস্তি বোধ করছিল। চোখের পাতা পড়ল বার কয়েক। মুখটাও কেমন ম্লান হল; বলল, "তাতে ক্ষতি কি?"

"মহীদা কি এ ব্যাপারেও সংযম অভ্যেস করছে?"

দেবযানীর মুখ কেমন লালচে হয়ে গেল।

নীলেন্দু নির্লজ্জের মতন তাকিয়ে থাকল। অপেক্ষা করছিল, দেবীদি কি বলে শোনার জন্যে। দেবযানী কিছু বলছিল না।

নীলেন্দুই বলল, "যে মানুষ বিয়ে করতে পারে তার এই ব্রহ্মচর্য পালনের ন্যাকামি আমার ভাল লাগে না। এটা যেন বাড়াবাড়ি।"

দেবযানী নীচু গলায় বলল, "কি জানি, আমি জানি না।"

নীলেন্দু অপলকে দেবযানীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাথার তল থেকে হাত উঠিয়ে নিল। তারপর হালকা করে হাত ধরল দেবযানীর, নিজের দিকে টেনে নিল। দেবীদির নরম হাত যেন সামান্য শক্ত হয়ে গিয়েছে। কিসের যেন মায়া ও সহানুভূতি বোধ করছিল নীলেন্দু।

অস্পষ্ট গলায় নীলেন্দু বলল, "মহীদা তোমার কাছে আসে না?"

মুখ নীচু করে বসে ছিল দেবযানী; বলল, "কাছেই তো রয়েছে।"

"না, আমি সে কথা বলছি না—" বলে নীলেন্দু দেবযানীর হাতে সামান্য চাপ দিল; যেন তার প্রশ্নটা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল।

দেবযানী নীলেন্দুর দিকে তাকাল। সামান্য মাথা হেলানো, মুখে কিছু বলল না, কিন্তু অল্প একটু ঘাড় নেড়ে এবং চোখের দৃষ্টিতে বুঝিয়ে দিল, মহীতোষ তার কাছে আসে।

নীলেন্দু বুঝতে পারল, মহীদা একেবারে স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন যাপন করতে অনিচ্ছুক, আবার পুরোপুরি ব্রহ্মচর্য পালনও করছে না। প্রথম থেকেই এ ব্যাপারে তার সন্দেহ ছিল।

কিছু সময় চুপচাপ থাকার পর নীলেন্দু বলল, "তোমায় একটা কথা বলব ?"

"বলো।"

"তুমি হয়ত রাগ করবে। ভাববে, আমি পরের চরকায় তেল দিচ্ছি।"

"বলো, শুনি।"

"মহীদা তোমায় পুরোপুরি মনের শান্তি দিতে পারছে না।"

দেবযানীর ছাঁদ করা সুশ্রী মুখ বিষণ্ণ হয়ে এল। চোখ যেন আধ বোজা। নীলেন্দুর হাতের মধ্যে তার হাত সামান্য কেঁপে উঠল।

"তুমি হয়ত এটা স্বীকার করতে চাইবে না..."

"কেন, আমি তো ভালই আছি," দেবযানী মৃদু গলায় বলল।

"ওটা তোমার মনের কথা নয় দেবীদি ; আমি তোমায় জানি।"

"তুমি যা জানতে তারপর কত বদলে গিয়েছি...।"

"গিয়েছ। কিন্তু মানুষ কি পুরোপুরি বদলাতে পারে ?...আমার কি মনে হয় জানো, মহীদার সঙ্গে চলে এসে তুমি ভুল করেছ।"

"ও কথা বলো না—।"

"তুমি বারণ করলেও আমি বলব। তোমার ভালবাসার আমি নিন্দে করছি না। তোমার মতন মেয়ের কপালে যা জুটেছে আমি তার নিন্দে করছি। আমার খুবই সন্দেহ হচ্ছে দেবীদি, মহীদার কাছে তুমি উপলক্ষ মাত্র। হয়ত মহীদা আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে আসার একটা সুযোগ খুঁজছিল। তুমি সেই সুযোগ। সে নিজেও হয়ত

জানে না, বোঝে নি। তোমার ভালবাসা তার কাছে ছুতো হয়ে দাঁড়াল। নিজের বিবেকের কাছে সে কৈফিয়ত খাড়া করবে তোমায় দেখিয়ে। কিন্তু তা বোধ হয় সত্যি নয়। মহীদা আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে। একদিন তোমার কাছ থেকেও পালাবে।"

দেবযানী প্রবল আপত্তি জানিয়ে মাথা নাড়ল। "পালাবে কেন! না না।"

"না পালাক, তোমার কাছেই থাকল; কিন্তু কাছে থাকলেই কি নিজের জিনিস হয় দেবীদি! মহীদাকে তুমি যেমন করে আঁকড়ে ধরেছ. সে তোমায় তেমন করে আঁকড়ে ধরবে না। তার স্বভাবই হল সরে থাকার। শান্তি তুমি পাবে না।...তোমার কপাল!"

দেবযানী নীরব। গাঢ় বেদনায় তার মুখ থমথম করছিল।

## আট

কলকাতায় ফিরে এসে নীলেন্দু একটা পারিবারিক ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জড়িয়ে পড়ল। ছোট ভাই স্কুটারে অ্যাকসিডেন্ট করে হাসপাতালে শয্যাশায়ী, কোমরের হাড় ভেঙে গিয়েছে, মাথায় চোট, দিন তিন-চার বাড়ির লোকের বড় উৎকণ্ঠায় কেটেছে। নীলেন্দুকে বাড়ি আর হাসপাতাল করতে হল কটা দিন। তারপর ভাইয়ের অবস্থা সামান্য ভালোর দিকে ফেরার পর নীলেন্দু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অবশ্য হাসপাতাল আসা-যাওয়া বন্ধ হল না, কোমরের ভাঙা হাড় নিয়ে শুভেন্দুকে এখনও অনেক দিন পড়ে থাকতে হবে হাসপাতালে, তার খোঁজখবর করার দায়টা নীলেন্দুর থেকে গেল।

নীলেন্দুদের বাড়ির আবহাওয়া খানিকটা অদ্ভুত রকমের। আজকের দিনেও একটা পরিবার একান্নবর্তী সংসারের নিয়মকানুন মেনে চলছে এ যেন বড় দেখা যায় না। পুরোনো আমলের বাড়ি, তার

কড়িকাঠে ঘুণ ধরে যাবার অবস্থা ; দালানের ফাঁকে ফোকরে পায়রার দল বাসা বেঁধে নিশ্চিন্তে পড়ে আছে বছরের পর বছর। নীলেন্দুর বাবারা তিন ভাই, তার বাবাই বড়। মেজ ভাই জন্ম থেকেই হাবাগোবা গোছের অথচ দেখতে খুবই সুপুরুষ। বড় ভাই, মেজ ভাইটিকে সেই কৈশোর থেকে নিজের পাশে নিয়ে হাত ধরে হেঁটে চলেছেন। ছোট ভাই দাদার ওপর অতটা নির্ভরশীল না হলেও দাদার অনুগত। তিন ভাই, তাদের স্ত্রী, পুত্রকন্যা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন মিলে প্রায় জনা তিরিশেকের সংসার। ভাইরা নিজেদের স্ত্রী-কন্যা নিয়ে বাড়ির এক একটি অংশে স্থান পেলেও বড় বড় ছেলেদের থাকা-খাওয়াটা অনেকটা মেসবাড়ির মতন, সবই বারোয়ারি, নিজেদের জন্যে নির্দিষ্ট বলে কিছু নেই।

নীলেন্দু এ বাড়ির ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে তা নয়। মেজ-কাকার ছেলেই বড়। নীলেন্দুর এক দিদি ছিল, সেই দিদিই এই বংশের প্রথম সন্তান। দিদির পর, নীলেন্দুর আগে একটি ছেলে এসেছিল, আঁতুড়েই মারা যায়। বাবা মেজকাকার বিয়ে দেন ওই ঘটনার মাস কয়েক আগে। মেজকাকার ছেলে বিশুদাই বাড়ির প্রথম পুত্রসন্তানের মর্যাদা পেল ; তার পরের বছর বেচারী নীলেন্দু জগতে এল। নীলেন্দুর পর মেজকাকার মেয়ে জয়া। এই ভাবে সংসার বেড়ে চলল। ছেলেমেয়েরা আসতে লাগল, প্রায় পিঠোপিঠি। ছোটকাকার বিয়ের পর পুত্রকন্যাদের জন্মহার আরও বাড়ল। এখন হরেদরে হিসেব করলে তিন ভাইয়ের ছেলেমেয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে জনা বারো। তার মধ্যে দু-একজন মারা গেছে। এর সঙ্গে পিসতুতো ভাইবোন জুটে সংখ্যা পনেরো-টনেরোতে দাঁড়িয়ে আছে এখন।

নীলেন্দুর বাবা ব্যবসায়ী মানুষ, বাড়ি তৈরীর লোহালক্কড়ের কারবার করেন, মেজো ভাই বরাবরই দাদার সঙ্গে দোকানে বসে। ছোট ভাই অবশ্য ব্যবসায় ঢোকে নি, ওকালতি পাশ করে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে প্র্যাকটিস করছে আজ এক যুগ। ভালই চালাচ্ছে।

মেজকাকার ছেলে বিশুদা এ বাড়ির রীতিনীতিতে প্রথম ঘা দিল। নিজের খুশিমতন বিয়ে করল, স্বজাতের মেয়ে নয়, বিয়ে করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। এখন দক্ষিণেশ্বরের দিকে থাকে, চাকরি করে ব্যাংকে। বছরে এক-আধবার বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে দেখা করতে আসে এই মাত্র, নয়ত বাড়ির সঙ্গে তার আর কোনো সম্পর্ক নেই।

নীলেন্দুর চেয়ে সামান্য ছোট মেজকাকার মেয়ে জয়াও একসময়ে একটা গোলমেলে কাজ করতে যাচ্ছিল, বাবার চোখে পড়ায় সেটা বন্ধ হল। জয়ার বিয়ে দিল বাবা। ওরা এখন দুর্গাপুরে থাকে। সুখে আছে একথা হয়ত বলা যায়।

বাবার বয়েস হয়ে গেছে, মেজকাকারও। বাবাকে বেশ বুড়ো দেখায়, মাথার সমস্ত চুল পাকা, মুখে সারা জীবনের ক্লান্তি, দায়িত্ব বোধের ছাপ পড়েছে গভীর ভাবে। মেজকাকাও আর সুস্থ নয়, দাদার অবর্তমানে কি করবে সেই দুশ্চিন্তায় এখন থেকেই যেন গুটিয়ে যাচ্ছে। ছোটকাকা সেসব দিক থেকে ভালই রয়েছে। তবে দাদা না থাকলে যে তার ঘাড়েই এই এতগুলো মানুষের বাঁচামরা, আপদ বিপদ, সুখ দুঃখ নির্ভর করছে এ কথা ভেবে মাঝে মাঝে মুষড়ে পড়ে।

ছোটকাকা নীলেন্দুকে কিঞ্চিৎ বেশী স্নেহ করে, কারণ এক সময়ে নীলেন্দুর বাল্যকালে ছোটকাকা তার গুরুগিরি করে গেছে নির্বিবাদে। এখনও মাঝে মাঝে তার বোধহয় ইচ্ছে হয়, ভাইপোকে খানিকটা মানুষ করে তোলার। ক্ষমতায় কুলোয় না।

একদিন হাসপাতালে শুভেন্দুর সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসার সময় ছোটকাকা বলল, "তুই একটা চাকরি করবি?"

"চাকরি? কোথায়?"

"করবি তো বল; আমার এক মক্কেলের হাত আছে। বললেই হয়ে যায়।"

নীলেন্দু মাথা নেড়ে বলল, "চাকরি আমার দ্বারা হবে না।"

"হাজার হাজার লোক চাকরি করছে আর তোর দ্বারা হবে না মানে—?"

"ওই দশটা পাঁচটা…"

"দশটা পাঁচটায় কি হয়েছে ! চাকরির একটা সময় আছে। তোর খুশিমতন তো কেউ চাকরি দেবে না।"

নীলেন্দু একটু চুপ করে থেকে বলল, "আমি পারব না। তুমি অন্য কাউকে দাও। আমার এক বন্ধু আছে—তাকে দিতে পার, বড্ড দরকার তার।"

"বন্ধুটন্ধু থাক। এতকাল বন্ধুগিরি করে কেটেছে, এবার নিজের দিকে তাকা। বয়েসটা কমছে না বাড়ছে? গাধা কোথাকার !" ছোটকাকা রাগ করে বলল।

নীলেন্দু হাসল। কথাটা তার নতুন শোনা নয়, কতকাল ধরে শুনছে। গুরুজনরা এই একই কথা বলে বলে হায়রান হয়ে থেমে গেছে শেষ পর্যন্ত।

হাসি দেখে ছোটকাকা আরও রেগে গিয়ে বলল, "তোর হাসতে লজ্জা করে না। বড়দা আর বেশীদিন বেঁচে থাকবে না, ব্লাড সুগার কত বেড়েছে জানিস ? সেবার যে শরীর খারাপ হল—সেটা হার্ট অ্যাটাক না হলেও এই বয়েসে যে-কোনো সময় হতে পারে। তখন কি করবি ? চোখে অন্ধকার দেখতে হবে। মেজদা ওই ব্যবসা চালাতে পারবে না।"

"পরের কথা পরে। লোহালক্কড়ের ব্যবসায় আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই।"

"কিসে তোর ইন্টারেস্ট আছে ? এম এ-টাও তো পড়লি না।"

"কি হত পড়ে ! এত ছেলে পড়ছে, তাদের কি হচ্ছে !"

ছোটকাকা অধৈর্য উত্তেজিত হয়ে বলল, "তোর সঙ্গে কথা বলা যায় না। তুই জেগে জেগে ঘুমোস। ঠিক আছে, পরে বুঝবি…, তখন আমার কথা তোর মগজে ঢুকবে।"

নীলেন্দু কিছু বলল না।

কি আশ্চর্য, শুভেন্দু হাসপাতাল থেকে ফিরল, শীত তখন ফুরিয়ে গিয়েছে, একটা মানসিক স্বস্তি ফিরে এল, তার পরই দোলের সময় বাবা বাড়িতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেল। ধরাধরি করে বিছানায় এনে শোয়ানোর পর পরই মনে হল, বাবা আর নেই। পাড়ার ডাক্তার ছুটে এল। বলল, হার্ট অ্যাটাক বলেই মনে হচ্ছে।

বাবাকে নিয়ে দেড়-দু মাস কাটল। সত্যিই হার্ট অ্যাটাক। দোকানপত্রে আসা-যাওয়া বন্ধ হল, খাওয়া-দাওয়ায় ধর. কাটা, পনেরো দিন অন্তর ব্লাড সুগার দেখানো, হাঁটা-চলাও নিষেধ।

গরমের মুখে বাবা মোটামুটি সুস্থ হলেও আর স্বাভাবিক হতে পারল না। দোকান যাওয়া স্থায়ী ভাবে বন্ধ হয়ে গেল।

গরমের শেষাশেষি, যখন বর্ষা নামব-নামব করছে তখন একদিন নীলেন্দু একটা চিঠি পেল। দেবযানীর চিঠি।

চিঠি পেয়ে নীলেন্দু অবাক। এটা সে আশা করে নি। বলতে কি, মহীতোষদের আস্তানা থেকে ফিরে আসার পর নীলেন্দু ওই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় নি, অবসরও পায় নি।

সাংসারিক নানা ঝঞ্ঝাট ঝামেলার মধ্যে মহীদাদের কথা যখনই মনে পড়েছে নীলেন্দু বিরক্তি বোধ করেছে, আর অধিকাংশ সময়ে জোর করে চিন্তাটা সরিয়ে দিয়েছে। মহীদাদের নিয়ে তার করার কিছু নেই, ওদের জীবনের সঙ্গে নীলেন্দুর জীবনের কিই বা সম্পর্ক! এমনকি নীলেন্দু তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব—যারা মহীদার খোঁজখবর শুনতে উৎসাহী তাদেরও কিছু বলে নি—মহীদাদের সঙ্গে তার দেখাশোনার খবরটা গোপন রেখেছে।

দেবযানীর চিঠি পেয়ে নীলেন্দু অবাক হল। হঠাৎ চিঠি কেন?

সিঁড়ি দিয়ে নিজের তেতলার ঘরে উঠে আসার সময় নীলেন্দু দেখল, সন্ধ্যের মুখে পাতলা বৃষ্টি নেমেছে। আকাশ কালো, বিদ্যুৎ

চমকাচ্ছে ভীষণ ভাবে। বাতাসের প্রবল দমকা থেকে অনুমান করা যাচ্ছিল, একটু পরেই জোর বৃষ্টি নামছে।

নিজের ঘরে এসে নীলেন্দু বাতি জ্বালল। তার ঘর ছোট। এই ঘরটা ঠিক তেতলাতেও নয়, আরও কয়েক সিঁড়ি ওপরে, অনেকটা চিলেকোঠার মতন ঘর। পাশেই বড় ছাদ; ছাদ জুড়ে কত রকম সাংসারিক আবর্জনা, কাপড় শুকোবার খুঁটি, রেডিয়োর এরিয়াল লাগানোর উঁচু উঁচু বাঁশ, কিছু ভাঙাচোরা প্যাকিং বাক্স, একটা মুরগি রাখার বড় খাঁচা, জলের ভাঙা ট্যাংক। ময়লা ছাদ, কালচে আলসের গায়ে কয়েকটা ফুলের টব, গাছ-টাছ নেই, দিনের পর দিন ওই ভাবে পড়ে আছে।

ঘরের জানলা খুলে দিতেই বাতাস এল দমকা। এখনও বৃষ্টি একই ভাবে চলেছে। শুকনো মাটির গন্ধ এবং কেমন একটা গরম ভাপ আসছে। এই বৃষ্টি এখন পর্যন্ত মাটি ভেজাতে পারে নি।

চেয়ারে নয়, একেবারে সরাসরি বিছানায় বসে নীলেন্দু দেবযানীর চিঠিটা আর একবার দেখল। দেবীদিরা কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যাবার পর কিন্তু একটাও চিঠি দেয় নি। সে-সময় নীলেন্দু কিন্তু আশা করত, কোনো না কোনো দিন সে অন্তত দেবীদি কিংবা মহীদার একটা চিঠি পাবে। অথচ পায় নি।

খাম ছিঁড়ে চিঠিটা বার করে নিল নীলেন্দু।

দেবীদির সেই গোটা গোটা স্পষ্ট মেয়েলী হাতের লেখা। খুবই চেনা। অনেক কাল পরে আবার সেই লেখা দেখতে পেল। হাতের লেখার সঙ্গে মানুষটাই যেন তার চোখের সামনে এসে দাঁড়াল!

দেবীদি লিখেছে ঃ

"নীলু,

অনেক লজ্জা নিয়ে তোমায় এই চিঠি লিখছি। তুমি ভাববে যখন আমার নিজের দরকার হল তখন তোমার কথাই আমার মনে পড়ল। কথাটা কিছু মিথ্যে নয়। তা হলেও বলছি, তুমি চলে

যাবার পর থেকে কতবার ভেবেছি তোমার একটা চিঠি পাব ; পাই নি। নিজেরও ইচ্ছে হত চিঠি লিখি তোমায়, নানা রকম ভেবে আর লেখা হত না। আমার চিঠি পেয়ে তুমি অবাক হবে, রাগ করবে, ভাববে আমি বড় স্বার্থপর। সব জেনেও তোমায় চিঠি লিখছি। প্রথমে কাজের কথা বলি।

তোমার মহীদা আজ ক'মাসেও বিশেষ কিছু করতে পারে নি। তার সেই ধানের জমি আর কেনা হল না। বর্ষার মুখে আর হবেও না। এখন যার যার জমি তারা চাষের কাজে নেমেছে। তাঁতঘরের কাজকর্ম শুরু হয়েছে। ওদিকে জঙ্গলের দিকে সেই যে দশ বিঘে জমি কিনেছিল—সেই জমি নিয়ে দিনরাত্তির পড়ে আছে। টাকা পয়সার অভাব যাচ্ছে বলেই তোমার মহীদার কাজকর্ম আটকে পড়েছে। আমার যে টাকা ব্যাংকে ছিল তার খানিকটা আবার বাধ্য হয়েই তাকে নিতে হয়েছে, এতে তার মনের শান্তি নষ্ট হচ্ছে। পরিতোষকে চিঠি দিয়ে দিয়ে তোমার মহীদা হয়রান। পরিতোষ বাড়ি বিক্রির কথায় গা দিচ্ছে কি না বুঝতে পারছি না। প্রতি বারই লেখে চেষ্টা করছি। তোমার মহীদা বলছিল কলকাতায় গিয়ে পরিতোষের সঙ্গে কথা বলবে। আমি বললুম, কথা বললেই কি বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবে! আমি তাকে আটকে রেখেছি। পরিতোষ হয়ত খুব ঝামেলা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ছিল। তার চিঠি থেকে বুঝতে পারলাম—ওর বউ রানুর বাচ্ছা হবার সময় বড় বিপদ গিয়েছে। এই সব সাত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ও হয়ত বাড়ি বিক্রির ব্যাপারে কিছু করতে পারছে না। আমি ভাবছিলাম, তুমি যদি একবার পরিতোষের কাছে যাও, গিয়ে বুঝিয়ে সব বলো। তুমি সবই দেখে গেছ। তোমার মুখ থেকে শুনলে পরিতোষ টাকার প্রয়োজনটা বুঝবে। ওকে তুমি বলা-কওয়া করলে ওর হয়ত চাড়ও হবে। এতদিন ধরে যে কেন কিছুই পারতে পারছে না—আমি বুঝতে পারছি না। তোমায় আর বেশী বলে কি করব, সবই বুঝতে পারছ।

তুমি চলে যাবার পর আমি একটা ব্যাপারে বড় ভয় পেয়ে গিয়েছি। এখন আমার প্রায়ই এই সন্দেহ হয়, তোমার মহীদা আমায় কি ভাবে নিয়েছে! আমি কি তার উপলক্ষ মাত্র? কখনো কখনো মনে হয়, তুমি ঠিকই ধরেছ। আমায় তার প্রয়োজন হয়েছিল—। এসব কথা মনে এলে কি যে হয় তোমায় বোঝাতে পারব না। আমার সব যেন ফাঁকা হয়ে যায়। কি জানি কেন এমন হল? তুমি আমার মনে ওই সন্দেহটা জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছ একথা বললে তোমায় দোষ দেওয়া হবে। আমি তা দিতে চাই না। আমার মনের মধ্যেই কোথাও সন্দেহটা হয়ত ছিল, তুমি সেটা নষ্ট করে দিয়ে গেছ!

চিঠিতে তো সব কথা লেখা যায় না, লিখতেও লজ্জা করে। তুমি এসে আমাদের যা দেখে গেছ, জেনে গিয়েছ—তার পরও অনেক পরিবর্তন ঘটে গেল এই ক'মাসেই। আমি সেসব কথা লিখব না। একটা কথা শুধু বলি, যত দিন যাচ্ছে তোমার মহীদা ততই আমার কাছে দূরের জিনিস হয়ে যাচ্ছে। আজকাল মাঝে মাঝেই কথা কাটাকাটি হয়, আগেও হয়েছে—কিন্তু আগে আমাদের মধ্যে যা ছিল এখন যেন তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে সামান্য মন-কষাকষিতে যে অশান্তি হয় তার জের আর কাটতে চায় না।

যাকগে, আমার কথা থাক। তোমার মহীদার হয়ত মন ভেঙে যাচ্ছে। তার মন ভাঙুক আমি তা চাই না। কিন্তু টাকা পয়সা না পেলে ওর কাজকর্ম কেমন করে হবে? তুমি একবার পরিতোষের সঙ্গে দেখা করে কিছু করতে পারলে বড় ভাল হয়। পরিতোষকে তুমি এখানকার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিও।

তোমার খবর-টবর কিছুই জানতে পারি না। যদি অনিচ্ছা না থাকে জানিও। তোমাদের বাড়ির খবর লিখো। সবাই ভাল আছে তো? আমি নিজের গরজে চিঠি লিখলাম। তবু তোমার চিঠির আশায় থাকব। ইতি তোমার দেবীদি।"

চিঠিটা বার দুই পড়ল নীলেন্দু। ততক্ষণে বর্ষা নেমে গিয়েছে

প্রবল ভাবে। বাতাস ঠাণ্ডা। জলের ঝাপটা এসে ঘর ভিজে যাচ্ছিল।

জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে এল নীলেন্দু। দরজা দিয়ে জলের ছাট আসছে না। সমস্ত ছাদ জুড়ে বৃষ্টি পড়ছে, শব্দ হচ্ছে, কালো ছাদ সন্ধ্যের অন্ধকার আর বর্ষার ঘটায় একেবারে যেন অন্ধকার।

নীলেন্দু দরজার কাছে কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে থাকল। কোনো কিছুই তার মনে স্থিরভাবে বসছিল না, কোনো একটি ভাবনাতেই তার চিন্তা বাঁধা থাকছিল না—আজ পাঁচ-সাত বছরের নানা দৃশ্য যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে তার মনে আসছিল, আবার চলে যাচ্ছিল।

দরজার কাছ থেকে চলে এল নীলেন্দু। তার ঘরে আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই। একটা সরু খাট, বইয়ের র‍্যাক আর টেবিল চেয়ার—সবই পুরোনো আমলের, কাঠের আলমারি—সেটাও বছর তিরিশেকের পুরোনো।

নীলেন্দু যেন অবসাদ বোধ করে সিগারেট ধরাল, বিছানায় এসে বসল। খোলা দরজা দিয়ে এলোমেলো বাতাস আসছে বাদলার। প্রথম বর্ষার এই বৃষ্টি অনেকক্ষণ হয়ত চলবে। গত এক সপ্তাহে একদিন মাত্র জোর বৃষ্টি হয়েছিল, বাকি দু-তিন দিন অল্পস্বল্প। পাখা চালাবার কোনো প্রয়োজন বোধ করল না নীলেন্দু, ঘর ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। হাই তুলে বিছানার ওপর শুয়ে পড়ল, কোমরের ওপর অংশটা বিছানায়, বাকিটা ধনুকের মতন বাঁকা হয়ে খাটের পাশে ঝুলছে, পা মাটিতে।

কড়িকাঠের দিকে শূন্য চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে নীলেন্দু সিগারেটের অর্ধেকটা শেষ করে ফেলল, ছাই উড়ে বিছানায় পড়েছে তার খেয়াল নেই।

দেবযানীর এই চিঠি নীলেন্দুর প্রথমে পছন্দ হয় নি। বিতৃষ্ণা, নাকি একেবারেই অনুৎসাহ বোধ করেছিল। হয়ত এক ধরনের নিষ্ঠুর

সুখও বেশ হয়েছে, খুবই ভাল হয়েছে ; এই রকমই হওয়া দরকার ছিল, মহীদা খানিকটা শিক্ষা পেয়েছে, আরও পাবে। নীলেন্দু পরিতোষের কাছে যাবে না, তার যাবার কোনো দরকার নেই। কেন যাবে ? যখন তোমরা কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছিলে তখন কি নীলেন্দুকে বলে গিয়েছিলে ? পালিয়ে যাবার পর এতকাল তোমরা কি নীলেন্দুকে মনে করে একটা চিঠি লিখেছ ? তখন নীলেন্দুকে তোমরা বিশ্বাস করতে পার নি, ভয় ছিল পাছে কোনো গোলমালের মধ্যে জড়িয়ে পড়ো, অথচ আজ তোমরা দায়ে পড়ে আবার তার শরণাপন্ন হচ্ছ !

বিছানার ওপর অল্প উঠে বসে সিগারেটের টুকরোটা দরজার দিকে ছুঁড়ে দিল নীলেন্দু। আবার শুয়ে পড়ল।

দেবীদি যদি কাছে থাকত, বা এমন হত দেবীদির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা যেত, নীলেন্দু এই মুহূর্তে স্পষ্টই বলত, 'নো নো, আমি কোথাও যেতে পারব না। পরিতোষ-টরিতোষকে কিছু বলা আমার দ্বারা হবে না। তোমাদের ব্যাপার তোমরা বোঝ, আমায় জড়িয়ো না।'

বলতে কি, দেবীদির এই অনুরোধের কোনো মানে হয় না। নীলেন্দু পরিতোষের কেউ নয়, মহীদার সুবাদে অবশ্য ভাল আলাপ আছে পরিতোষের সঙ্গে, খুব যে পছন্দও করে তাকে পরিতোষ তাও হয়ত নয়, কাজেই নীলেন্দু গিয়ে কিছু বললে যে পরিতোষ কথা শুনবে এমন মনে করার কারণ নেই কিছু। দুই ভাইয়ের ব্যাপারে বাইরের লোকের নাক গলানোও উচিত নয়।

নীলেন্দু পরিতোষের কাছে যাবে না—এটা স্থির করে নিয়ে নিজের মনেই মাথা নাড়ল। এবং ব্যাপারটা মাথা থেকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে অন্য কিছু ভাববার চেষ্টা করল। বৃষ্টির শব্দ শোনার জন্যে কান পেতে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর আজ সকালে ছোটকাকার এক দেড়মনী মক্কেলের রিক্সা থেকে নামার হাস্যকর দৃশ্য ভাববার চেষ্টা করল। দুপুরে মেজকাকিমার সঙ্গে মায়া—মেজকাকিমার মেয়ের

মজার ঝগড়া, খানিকটা আগে ট্রামে দুই ভদ্রলোকের হাতাহাতি—এই সব টুকরো টুকরো দৃশ্যে মন ধরে রাখার চেষ্টা করল।

নানা রকম চেষ্টা সত্ত্বেও সেই মহীদা আর দেবীদি, কানা মাছির মতন ঘুরে ঘুরে মনে এসে বসছে। নীলেন্দু বিরক্ত হয়ে উঠল। তার রাগই হচ্ছিল শেষ পর্যন্ত।

বৃষ্টির সেই ঝমঝমে ভাবটা কমে আসছে। থেমে যাবে? না কি থামবে না? একসময় দেবীদির সঙ্গে তার এই বৃষ্টি থামা না-থামা নিয়ে বাজি হত। যেমন দুজনে কোথাও যাবে বলে অপেক্ষা করছে, বৃষ্টি এল; দেবীদি বলল, 'মিনিট পনেরোর মধ্যেই থামবে—'; নীলেন্দু বলল, 'আধ ঘণ্টার আগে নয়—', সঙ্গে সঙ্গে বাজি ধরে ফেলল দেবীদি, 'তোমায় একটাকা খাওয়াব'; নীলেন্দু বলল, 'দু টাকার খাওয়াব তোমাকে'; 'তোমায় সিনেমা দেখাব', 'তোমায় থিয়েটার দেখাব'···এই চলত। কখনো দেবীদি জিতে যেত, কখনো নীলেন্দু।

এখন এই বৃষ্টি থামা না-থামা নিয়ে বাজি ফেলতে একবার ইচ্ছে করল নীলেন্দুর। যদি পনেরো মিনিটের মধ্যে থামে তবে সে দেবীদির কথামতন একবার পরিতোষের কাছে যাবে। যদি না থামে, কোনো দিনই যাবে না।

বাজিটা অবশ্য ফেলল না নীলেন্দু।

আধ ঘণ্টার মাথায় বৃষ্টি অনেকটা কমে এলে নীলেন্দু নীচে বাথরুমে চলে গেল। ফিরে এসে মুখ মাথা হাত পা মুছল। পরনে পাজামা, গায়ে গেঞ্জি। খাওয়া-দাওয়া হতে এখনও অনেক দেরি।

বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল নীলেন্দু। ঘুমোতে ইচ্ছে করছিল যে তা নয়, অন্ধকারে চুপচাপ শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল, যদি শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়েও পড়ে ক্ষতি নেই, মায়া এসে ডেকে নিয়ে যাবে খাবার ঘরে।

চুপচাপ শুয়ে থাকতে ভালই লাগছিল নীলেন্দুর। জানলা খুলে

দিয়েছে। বৃষ্টিভেজা ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল। বাতাসে হয়ত দু-চার ফোঁটা জলবিন্দু উড়ছে, আপাতত বৃষ্টি নেই, আকাশে বিদ্যুৎচমক রয়েছে, মেঘ ডাকছে এখনও।

শুয়ে থাকতে থাকতে নীলেন্দু কেমন করে যেন পিছু হটতে হটতে তার প্রথম যৌবনে চলে গেল। দেবীদির সঙ্গে তার প্রথম আলাপ-পরিচয়ের মধ্যে কোনো ঘটনা নেই। দেবীদির ছোড়দার কাছে ও-বাড়িতে যেত, আসা-যাওয়া করতে করতে আলাপ। দেবীদির সঙ্গে আলাপ হবার পর নীলেন্দু একদিন দুটো টিকিট নিয়ে এল ম্যাজিকের, পাড়ার চ্যারিটি শো ; ছোড়দা যাবে না, জ্বর হয়ে বিছানায় শুয়ে রয়েছে, দেবীদিকে নিয়ে নীলেন্দু ম্যাজিক দেখতে চলল একটা সিনেমা হাউসে। পাশাপাশি বসে ম্যাজিক দেখতে দেখতে দেবীদি হঠাৎ বলল, 'তোমার ভাল লাগছে ?'···নীলেন্দুর মোটামুটি লাগছিল, বলল, 'জমছে না। বড় বড় খেলা না হলে জমে না।' দেবীদি বলল, 'ছেলেমানুষি খেলা।···চলো বাইরে যাই, চা কফি খেয়ে আসি।' ···খানিকটা পরে দুজনেই বাইরে এসে হাঁফ ফেলল। দেবীদি বলল, 'বাব্বা বাঁচলাম, চলো অন্য কোথাও যাই, বেড়িয়ে আসি।'···সেটা শরৎকাল, তখনও তেমন রাত হয় নি ; একটা দোকান থেকে চা খেয়ে দুজনে হাঁটতে হাঁটতে কাছাকাছি গড়ের মাঠের এক জায়গায় গিয়ে বসল। আকাশে তারা, আশেপাশে বড় বড় গাছ,কাছাকাছি ট্রাম লাইন, কিছু কিছু লোকজন সামনের পিচের রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলা করছিল। দেবীদি হঠাৎ কেমন মনখোলা হয়ে গেল, কত গল্পই না করল, ছেলেবেলার, বাবার গল্প, মার গল্প, কথায় কথায় কী হাসি, কত রকম মজার মজার কথা। নীলেন্দুর খুবই ভাল লেগেছিল। মনে হয়েছিল, বাড়িতে দেবীদির কথা বলার মতন কেউ নেই, মন খুলে গল্প করার মতন কাউকে পায় না, সে যেন কেমন নিঃসঙ্গ। নীলেন্দুকে সঙ্গী হিসেবে বোধ হয় ভাল লেগেছে দেবীদির।

সত্যিই যে ভাল লেগেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দেখতে

দেখতে দুজনে খুব মেলামেশা ভাবসাব-হয়ে গেল। নীলেন্দুকে ছাড়া যেন দেবীদির চলত না।

'এই, কাল একটা শাড়ি কিনতে যাব, যাবি ?'

'কোথায় ?'

'নিউ মার্কেটে।'

'তারপর ?'

'তোকে আইসক্রিম খাওয়াব।'

'একটা টেরিফিক ছবি হচ্ছে, জেমস বণ্ড। দেখাবে ?'

'না।'

'কেন ?'

'জেমস বণ্ড আমার ভাল লাগে না। গাঁজাখুরি।'

'তুমি কিস্সু বোঝ না। বণ্ড দেখাও তোমার সঙ্গে শাড়ির দোকানে যেতে রাজী।'

এই অন্তরঙ্গতা, বন্ধুত্ব এমন একটা সহজ সম্পর্কে দাঁড়াল ক্রমশ যে নীলেন্দু বা দেবযানী কেউই, স্বভাবতই যা হতে পারত, একটা সীমানার তলায় নেমে গেল না। নামলে ক্ষতি ছিল না, দুজনেই সাবালক, জীবনের সমস্ত চাহিদা এবং ঝোঁক তাদের অজানা নয়, সহজেই যুগল জীবনের অন্তর্গত হতে পারত। কিন্তু হয় নি। সম্ভবত দুজনেই বুঝত, সংসারের ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে বাঁধা পড়ে গেলে তাদের এই সরল অথচ গভীর সম্পর্ক যেন কোথাও তার গৌরব হারাবে।

নীলেন্দু মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলত, দেবীদি, 'দড়ির ওপর দিয়ে কেমন হাঁটছি বল তো ? আমি কিন্তু ব্যালেন্স-মাস্টার।'

দেবযানী আরও কৌতুকময়ী হয়ে বলত, 'দড়ি খুব নড়ছে ; আমাকে ফেলে দেবার চেষ্টা…'

'নেভার। তোমায় কে ফেলে ! তুমি ছাতা হাতে যা ব্যালেন্স করছ !'

'না করে উপায়, তুমি পড়লে আমিও পড়ব; আমি পড়লে তোমাকেও ফেলব।'

'পড়াপড়ির দরকার কি! সবাই তো পড়ে, আমরা পড়ব না। লোকের চোখ ছানাবড়া করে দেব।'

হাসি-তামাশা ঠাট্টা এ-সবের মধ্যে মাঝে মাঝে আচমকা কোনো গাম্ভীর্য এসে যেত। তখন যেন মনের কোথাও কোনো অপ্রকাশ্য অনুভব দুজনকেই গম্ভীর, অন্যমনস্ক, বিষণ্ণ করে তুলত।

একদিন গঙ্গার ঘাটে বসে প্রায়ান্ধকারে দেবযানী বলেছিল, 'এক একদিন আমার যে কী হয়···বড় ফাঁকা লাগে।'

নীলেন্দু বলেছিল, 'আমারও লাগে।'

'কি হবে বলতে পার?'

'পারি না।···যেটা যেকোনো সময়ে হতে পারে—সেটা হলে আমার বা তোমার যে বরাবর ভাল লাগবে তাও যেন মনে হয় না, দেবীদি। তখন আফসোস করার চেয়ে এই মনখারাপটা ভাল। নয় কি?'

দেবযানী কি মনে করে নীলেন্দুর হাত কোলে টেনে নিয়ে চুপ করে বসে থাকত।

এই অবস্থাতেই, যখন একে অন্যকে নিকটতম সঙ্গী, সবচেয়ে বড় বন্ধু, ঘনিষ্ঠতম করে অনুভব করত তখন মহীতোষের সঙ্গে দেবযানীর পরিচয়। অবশ্য একথা বলা ভাল, আরও কিছু আগে থেকে নীলেন্দু অন্য দিক থেকে জড়িয়ে পড়ছিল। দেবযানীর সঙ্গে যোগাযোগ না হারালেও দুজনের প্রায় নিত্য দেখাসাক্ষাৎ ঘটত না। দেবযানী রাগ করত, ঝগড়া করত, বকত। নীলেন্দু যখন লেখাপড়া ছেড়ে দিল তখন দেবীদির কি রাগ। প্রথম প্রথম নীলেন্দু সত্য কথাটা ভাঙতে চায় নি, আজেবাজে অজুহাত দিয়ে, মিথ্যে কথা বলে ভুলিয়েছে দেবযানীকে। পরে সত্যটা বলল।

দেবযানী বলল, 'তুমি ওদের সঙ্গে গিয়ে ভিড়েছ?'

'না।'

'না মানে—? এই বলছ…'

'আমি তোমায় কিছু বলি নি এখন পর্যন্ত; শুধু বলেছি—লেখাপড়া করে কি হবে, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে আরও একটা বাড়তি নাম লিখতে হবে। তা ছাড়া তোমায় সত্যি বলছি দেবীদি, লেখাপড়ায় আমি বরাবরের গবেট। কান ছুঁয়ে ছুঁয়ে তরে এসেছি। আমার কোনো ইণ্টারেস্ট নেই লেখাপড়ায়…'

'তা হলে তোমারি বাবার সঙ্গে ব্যবসাপত্র করতে বসো গে যাও।'

'অসম্ভব। ও আমার দ্বারা হবে না।'

'কি হবে তোমার দ্বারা?'

সেটাই ভাবছি। বোধ হয় কিছুই হবে না। ওআর্থলেসদের কিছুই হয় না। দেখো না, আমার ছেলেবেলা থেকে একটাই মাত্র অ্যামবিশান ছিল—কলকাতার মাঠে নাম্বার ওয়ান প্লেয়ার হব ফুটবলের। সে অ্যামবিগান শালা কবেই ভেঙে গিয়েছে, এখন আমি ফুটবল খেলার মাঠেও যাই না।

'চুলোয় যাক তোমার ফুটবল। শোনো, আমি তোমায় বলছি, তুমি আজকালকার এইসব হুজুগে মেতো না। মাতলে নিজেই বুঝবে অবস্থা কি দাঁড়ায়।'

তুমি একটা জিনিস ভুল করছ দেবীদি, আজকাল যা অবস্থা তাতে একেবারে সরে এসে দাঁড়িয়ে থাকা মুশকিল। তুমি মেয়ে, তোমার সরে থাকার উপায় আছে, আমাদের নেই, আমরা সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আছি।'

'তোমার মাথায় কে এই পোকা ঢোকাল নীলু? তোমার কোন্ বন্ধু? আমি যদি তাকে দেখতে পেতাম বুঝিয়ে দিতাম…'

নীলেন্দু হেসে বলল, 'তোমায় একদিন এক জায়গায় নিয়ে যাব, যাবে?'

'তোমাদের আড্ডাখানায়?'

'না। চলো না একদিন, যাবে ?'

'আমার দরকার নেই।'

এরও বেশ কিছু পরে একদিন নীলেন্দু দেবযানীকে নিয়ে মহীতোষের কাছে গেল।

নীলেন্দু ঘুমোয় নি, ভাবছিল; আচমকা মায়ার ডাক শুনল, "মেজদা, ও মেজদা···।"

বিছানায় উঠে বসার আগেই নীলেন্দু দেখল, মায়া ঘরের বাতি জ্বেলে দিয়েছে।

## নয়

পরিমলের কাছ থেকে উঠে পড়ার সময় নীলেন্দু বলল, "তুমি নিজেই একবার ঘুরে এস না!"

মাথা নাড়ল পরিমল। তার অনিচ্ছা যে কত তীব্র মাথা নাড়ার ভঙ্গিতেই বোঝা যায়।

নীলেন্দুর হাসি পাচ্ছিল। কিছু বলল না, তাকিয়ে থাকল। মহীতোষের সঙ্গে পরিমলের কোথাও কোনো মিল নেই, চেহারায় নয়, মুখের আদলেও নয়। স্বভাব সম্পূর্ণ আলাদাই। পরিমল এখনও বয়েসে নিশ্চয়ই ছেলেমানুষ—অন্তত মহীতোষের তুলনায়, কিন্তু তাকে অনেক বেশী সাবালক মনে হয়। জীবনের নানা অভিজ্ঞতা তাকে সক্ষম, সাবধানী, চতুর করেছে, তার চোখমুখ নির্বোধের নয়, উচ্ছ্বাসপূর্ণ কোনো রেখা সচরাচর তার মুখে ফোটে না। পরিমল কিন্তু ভদ্র, বিনীত, স্বাভাবিক। তার কথাবার্তা স্পষ্ট।

"আপনি কি কিছু লিখবেন, না আমি লিখব?" পরিমল জিজ্ঞেস করল।

"তুমিই লিখে দিও মহীদাকে; আমি দেবীদিকে লিখব।"

পরিমল ক' মুহূর্ত নত চোখে যেন কি ভাবল, তারপর মুখ তুলে বলল, "সমস্ত টাকাটাই জলে যাবে। আমি এতোদিন ধরে গড়িমসি করছিলাম, ভাবছিলাম দাদার খেয়াল মিটে গেলে আবার বাড়িতে ফিরে আসবে। দু দুবার খদ্দের ঠিক করেও শেষ পর্যন্ত এড়িয়ে গিয়েছি। আপনিই বলুন নীলেন্দুদা, আজকাল যে-রকম অবস্থা তাতে নিজের থেকে কিছু করা মুশকিল। বাপঠাকুরদা যা রেখে গেছে সেটা বেচে দিয়ে কি লাভ! দায়ে দরকারে পড়লে মানুষ নিশ্চয়ই বেচে দেয়। কিন্তু দাদার এই আহাম্মুকির জন্যে বাড়ি বেচে দেবার কোনো মানে হয় না। যাক গে, যে বুঝবে না—তাকে আর বুঝিয়ে কি লাভ! চিঠির পর চিঠি আর তাগাদা। রানু আমায় বকে, বলে দাদা আমাকে কি ভাবছে! মেয়েরা এসব ব্যাপার বোঝে না।...তা বউদিকেও আমি দোষ দিই। এত টাকা এভাবে দাদার হাতে তুলে দেওয়া উচিত হয় নি। ঠিক কিনা বলুন!"

নীলেন্দু বলল, "আমি আর কি বলব ভাই! যার টাকা সে যদি দেয়...।"

"দিয়েই ভুল করেছে। ...টাকা হাতে পেলে খেয়াল মেটাবার শখ অনেকেরই হয়।"

নীলেন্দু উঠে পড়ল। রাত হয়ে যাচ্ছে।

পরিমল বলল, "আপনি বউদিকে লিখে দিন, যা করার আমি করবার চেষ্টা করছি। দাদাকে আমি চিঠি দেব। ...দেখি কিছু টাকার যদি ব্যবস্থা করতে পারি।"

নীলেন্দু আর দাঁড়াল না, হাত তুলে বিদায় জানাবার ভঙ্গি করে বলল, "চলি—"

পরিমল নীলেন্দুকে এগিয়ে দেবার জন্যে উঠে পড়ল।

বাড়ির বাইরে এসে পরিমল হঠাৎ বলল, "আপনাদের ব্যাপারটা তা হলে শেষ পর্যন্ত ভেঙে গেল!"

তাকাল নীলেন্দু। পরিমল কি তাকে ঠাট্টা করছে, নাকি সান্ত্বনা

দিচ্ছে বোঝবার চেষ্টা করল। বলল, "তুমি মহীদা আর আমাদের কথা বলছ? ...হ্যাঁ, তা ভেঙেই গিয়েছে বলতে পার।" বলে নীলেন্দু আর অপেক্ষা করল না, কেননা পরিমল অত বোকা নয়, সে আরও কিছু জিজ্ঞেস করে ফেলতে পারে, করলে নীলেন্দুর এই চালাকি ধরা পড়ে যাবে।

খানিকটা ব্যস্ত ভাবে নীলেন্দু গলিটুকু পেরিয়ে এল। সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছে। বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে এপাশ ওপাশ তাকাল। সামান্য এগিয়ে পানের দোকান।

দেবীদির জন্যে শেষ পর্যন্ত আসতেই হল তাকে। এসে কোনো কাজ হল কিনা সে জানে না। জানার দরকারও নেই। তবে পরিমলের ব্যাপারটা বোঝা গেল। পরিমল অনেক হিসেবী ছেলে, তার দূরদৃষ্টি রয়েছে। যে পুরোনো বাড়িটা বেচে দেবার জন্যে মহীদা এত ছটফট করছে—সেই পুরনো বাড়ির গায়ে বড় বস্তি, ভাঙা লোহালক্কড়ের আড়ত, পুরোনো ময়লা কাগজ জমাবার গুদোম—এ সমস্তই ভেঙে চুরে মাঠ করে একটা নতুন রাস্তা বেরুচ্ছে। মানে নতুন রাস্তা তৈরীর কথা। আশেপাশের কিছু বাড়িঘরও তাতে ভাঙাচোরা পড়বে। কাজেই মহীদাদের পুরোনো বাড়ি আর দু-চার বছর পরে যথেষ্ট মূল্যবান হয়ে উঠবে। জমির দরই কত বেড়ে যাবে। এ সময় ওই বাড়ি বিক্রি করা লোকসান, কটা বছর অপেক্ষা করে বেচতে পারলে দারুণ লাভ। পরিমল এই ব্যাপারটা ফেলতে পারে না, দাদার মতন সে নির্বোধ নয়। যদি শেষ পর্যন্ত বেচতেই হয়—পরিমল কি করবে নীলেন্দু জানে না—তবে যতটা পারে উঠিয়ে নেবার চেষ্টাই হয়ত সে করবে। যা করার করুক, মহীদাদের পারিবারিক ব্যাপারে তার গরজ নেই।

পাশের দোকান থেকে নীলেন্দু সিগারেট কিনল। কিনে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। বড় রাস্তা ধরে আরও খানিকটা হেঁটে ট্রাম।

কলকাতায় বর্ষা নেমে গেছে। আজ সারাদিন যদিও বৃষ্টি হয় নি,

তবু মেঘলায় মেখলায় কেটেছে, কখনো মেঘলা ঘন হয়েছে, কখনো ফিকে। আকাশে এখনও মেঘ ভাসছে, কোথায় বুঝি চাঁদ উঠে আছে, দেখা যাচ্ছে না, মেঘের গায়ে ময়লা জ্যোৎস্না পড়ছে মাঝে মাঝে।

নীলেন্দু হাঁটতে হাঁটতে ট্রাম স্টপের কাছে এসে দাঁড়াল। চারদিক তাকালে খুবই আশ্চর্য লাগে, ওপাশের রাস্তায় ইটের পাঁজার মতন ময়লা জমানো রয়েছে, সেই ময়লা উড়ছে বাতাসে ; অন্য দিকে মাটি খুঁড়ে পাহাড় জমানো, গাড়ি-টাড়িতে এখনও মানুষ গাদাগাদি করে বাড়ি ফিরছে, রিকশায় আলো নেই, একটা চাকা ভাঙা লরি কাত হয়ে একপাশে পড়ে।

নীলেন্দু বিরক্ত হলেও তেমন কিছু মনে করল না। কলকাতা শহরের চতুর্দিকে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে চোখ এখন অভ্যস্ত, মনও যেন আর বিরূপ হয় না, কেননা হয়ে লাভ নেই। একটা ট্রাম আসছিল। নীলেন্দু তাকাল। ভিড়। ভিড়ের মধ্যেই উঠে পড়ল নীলেন্দু।

সামনের দিকে যতটা পারে এগিয়ে যাচ্ছিল নীলেন্দু। হঠাৎ তার মনে হল ; লেডিস সিটে পাশাপাশি যারা বসে আছে তার মধ্যে একজনকে সে চেনে। কয়েক পলক লক্ষ করে দেখল নীলেন্দু। কোনো সন্দেহ নেই দেবেন আর দেবেনের বউ পাশাপাশি বসে। বউ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। গায়ে গা দিয়ে বসে নীচু গলায় কথা বলছে।

নীলেন্দুর একবার ইচ্ছে হল, দেবেনকে ডাকে। দেবেন বছর তিনেক বি ডিভিসনে খেলে শেষে রেলে চলে যায়। রেলওয়ের হয়ে দু-এক বছর খেলেছিল। হাঁটুতে জখম হবার পর আর খেলতে পারল না। চাকরিটা অবশ্য তার থেকে গেছে।

পরের স্টপে নীলেন্দুর পাশ কাটিয়ে জনা দুয়েক যাত্রী যাবার জন্যে এগিয়ে আসতে সে আরও একটু এগিয়ে গেল। মানে দেবেনদের ছাড়িয়ে সামনে চলে গেল। ট্রামের রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে নীলেন্দু কেমন কৌতূহলবশে আবার দেবেনের দিকে তাকাল।

দেবেন খানিকটা মোটা হয়েছে। তার বউকেও মন্দ দেখাচ্ছিল না, যদিও গায়ের রঙ কালো তবু চোখমুখ মিষ্টি ধরনের। একটু সাজগোজ করেছে তার বউ। বোধ হয় নেমন্তন্ন রাখতে গিয়েছিল কোথাও, বা সিনেমায় গিয়েছিল।

দেবেন তাকাল। নীলেন্দুর সঙ্গে চোখাচুখি হল। কিন্তু অন্য-মনস্ক থাকায় নীলেন্দুকে চিনতে পারল না। অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল।

আরও দু-তিন স্টপ পরে নেমে গেল দেবেনরা। সামনের এক ভদ্রলোকও নামলেন। নীলেন্দু বসবার জায়গা পেয়ে গেল।

সিটে বসে নীলেন্দুর হঠাৎ কেমন একটা মজার খেয়াল হল। আচ্ছা, যদি এমন হত দেবেন নয় নীলেন্দুই তার বউ নিয়ে বসে ট্রামে করে ফিরছে কেমন হত? দেবেন বেটা দেখত তাকে। নীলেন্দু যখন দেবীদিকে নিয়ে ঘুরে বেড়াত, ট্রামে বাসে ট্যাক্সিতে—তখন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে তারা যে ধরনের শয়তানি হাসি হাসত—তার মর্ম বোঝা নীলেন্দুর দুঃসাধ্য ছিল না। এমনও হত, কোনো বন্ধু পরে দেখা হলে রহস্যময় হাসি হেসে জিজ্ঞেস করত, 'কি রে, কবে হচ্ছে—?' মানে তারা জানতে চাইত নীলেন্দু কবে তার সঙ্গিনী মেয়েটিকে বিয়ে করতে যাচ্ছে!

নীলেন্দু রঙ্গ করে দেবযানীকে বলত, 'দেবীদি, আমার বন্ধুরা কিন্তু তোমাকে আমার প্রেমিকা ভাবে।'

দেবযানী কটাক্ষ করে জবাব দিত, 'যেমন সব বন্ধু তোমার।'

'তোমার বাড়ির লোক, চেনাজানারা আমাকে তা হলে কি ভাবছে?

'যা ভাববার ভাবছে।'

'আমি তোমার লাভার।'

'ইস্ কি আমার লাভার! গাল টিপলে দুধ পড়বে রে তোর···!'

'দুগ্ধপোষ্য বালকদের ভালবাসাই খাঁটি—বুঝলে দেবীদি, এ

ভালেবাসার তুলনা সেই···' বলে নীলেন্দু হো হো করে হাসত।

ট্রামের মধ্যে আচমকা হাসি এসে গেল নীলেন্দুর। কোন রকমে সামলে নিল।

আরও খানিকটা পথ এসে নীলেন্দু জানলার পাশে জায়গা পেল, তার পাশের ভদ্রলোক নেমে গেলেন। আরাম করে বসল সে। বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল। প্রায় কিছুই লক্ষ না করে শুধু অন্যমনস্কভাবে মানুষজন বন্ধ দোকানপাট গাড়ি দেখছিল নীলেন্দু। মনের মধ্যে বার বার কিসের যেন আঘাত এসে লাগছে বোঝা যাচ্ছে না। অনেক সময় জোয়ার আসার আগে নদীর পাড়ে এইভাবে জলের ধাক্কা এসে লাগে। অনেকটা সেই রকম। অথচ নীলেন্দু বুঝতে পারছিল না এই আঘাতের যথার্থ কারণ কি হতে পারে!

বাড়িতে ঢোকার আগেই কে যেন ডাকল। জায়গাটা অন্ধকার মতন, স্পষ্ট করে দেখা যায় না। নীলেন্দু কিছু বোঝবার আগেই তার গা ঘেঁষে যে এসে দাঁড়াল তাকে যেন প্রায় ছায়ার মতন দেখাচ্ছিল।

"নীলুদা আমি বুলবুল।"

"বুলবুল!"

"তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

নীলেন্দুকে বিশেষ কিছু বলতে হল না। বুলবুলকে বলল, "আয়—।"

বাড়িতে ঢোকার সময় নীলেন্দু যেন সামান্য আড়াল চাইছিল। সিঁড়িতে ছোটকাকিমার সঙ্গে দেখা হল, দোতলার মুখে মায়ার সঙ্গে; মায়া হাঁ করে বুলবুলকে দেখছিল। নীলেন্দু স্বাভাবিক হবার জন্যে মায়াকে বলল, "এই, দু কাপ চা করে আনতে পারিস? তাড়াতাড়ি?" বলে নীলেন্দু দাঁড়াল না, তেতলার সিঁড়ি ধরল।

নিজের ঘরে এসে নীলেন্দু বাতি জ্বালল।

আলোয় বুলবুল কেমন অস্বস্তি বোধ করে একবার বাতিটার দিকে তাকাল।

"বোস্—" নীলেন্দু বলল ; বুলবুলকে সে দেখছিল। বুলবুলের ছিপছিপে চেহারা হাড়সার হয়ে গিয়েছে, চোখ একেবারে হলুদ, গালে যেন একফোঁটাও মাংস নেই, নোংরা একটা জামা গায়ে, প্যান্ট আরও নোংরা, পায়ের চটিটার অবস্থাও বিশ্রী।

বুলবুল বলল, "কোথায় গিয়েছিলে ?"

"তুই কতক্ষণ এসেছিস ?"

"ঘণ্টা খানেক। গলিতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। বড় রাস্তায় বাসগুমটিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম।"

"বোস না, দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?"

তোমার এখানে জল আছে ?"

"খাবি ? দাঁড়া···"

নীলেন্দুর ঘরে কুঁজোয় জল ছিল। জল গড়িয়ে দিল নীলেন্দু।

জল খেয়ে বুলবুল চেয়ারে বসল !

নীলেন্দু গায়ের জামা ছাড়তে ছাড়তে বলল, "কি খবর বল্ ?"

বুলবুল যেন সামান্য জিরিয়ে নিচ্ছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল তারপর বলল, "তুমি একটা খবর জান ?"

"কি ?"

"বিজু কাল সুসাইড করেছে।"

নীলেন্দু যেন চমকে উঠল। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, "সে কি ! কই না, আমি কিছু শুনি নি।"

বুলবুল বলল, "বিজু জামসেদপুর থেকে দিন সাতেক আগে ফিরে এসেছিল, বাড়িতে যায় নি—ওদের পাড়ায় ঢোকাই যায় না। বিজু আমাদের কাছে এসে উঠেছিল। এমনিতে আমরা কিছু বুঝতে পারি নি। একবার শুধু সমরের সঙ্গে তর্ক করেছিল, বলেছিল—পলিসি অফ্ রিট্রিট্ চলছে বড়দের মধ্যে। তারা গা বাঁচাচ্ছে। আমাদের

জন্যে কেউ ভাবছে না, ভাববে না।…পরের দিন বিজু সুসাইড করেছে। বুলবুল শার্টের হাতায় কপালের ঘাম মুছল।

নীলেন্দু তখনও নিজেকে সামলাতে পারে নি। বিজু—মানে বিজন আত্মহত্যা করার মতন পলকা ছেলে নয়; ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা না থাকলেও নীলেন্দু বিজুকে মাঝে মাঝে দেখেছে, তার কথাও শুনেছে। শক্ত, জেদি ধরনের ছেলে, তার বাবা সরকারী চাকরি করে, বিজুকে একবার পুলিস ধরে নিয়ে গিয়েছিল সিঁথি থেকে, বেদম মারধোর করেছিল, আত্মীয়স্বজনরা ধরাধরি করে বিজুকে খালাস করে এনেছিল।” তার পরই বাড়ি থেকে জামসেদপুরে পাঠিয়ে দেয়, কোন মাসির কাছে।

বুলবুল বলল, “বিজুর ডেড্‌বডি বোধ হয় এখনও ঘরে পড়ে আছে।”

নীলেন্দু চমকে উঠল আবার; “কি বলছিস কি?”

“আমরা সকাল বেলায় উঠে বিজুকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে দেখেছি—”বুলবুল তার বাঁ হাত মাথার রুক্ষ ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে ডুবিয়ে দিশেহারার মতন বলল, “মানু প্রথমে দেখেছিল, দেখেই আমাদের ডাকল। সমর আর আমি পরে দেখলাম। উঃ, সে কি দেখতে নীলুদা, চোখে দেখতে পারবে না।”

নীলেন্দু নিজেকে সামলে নেবার জন্যে বুলবুলের দিকে আর তাকাচ্ছিল না। বুলবুলের সমস্ত মুখে বিহ্বলতা, ভয় যন্ত্রণা যেন কালশিটের মতন কালো হয়ে ফুটে উঠেছে।

“তোরা তো বাড়িতেই ছিলি…।” নীলেন্দু বলল।

“আমরা সকলেই ছিলাম। বিজু বোধ হয় মাঝ রাত্রে বা শেষ রাত্রে উঠে ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে গলায় দড়ি দিয়েছে।”

“ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে?”

“ঘরটা ছোট। পড়ে ছিল। মাথার ছাদে লোহার আঙটা লাগানো ছিল…আমরা কোনোদিন খেয়াল করি নি, জানতামও না।

সকাল বেলায় মানু ঘরের দরজাটা আধখোলা দেখে…" পায়ের শব্দ পেয়ে বুলবুল চুপ করে গেল।

মায়া এল। হাতে দু কাপ চা। বুলবুলকে আবার দেখল। এই ধরনের বিশ্রী চেহারা, পোশাক-আশাকের মানুষটিকে তার তেমন পছন্দ হল না, বরং সন্দেহই হল যেন কেমন।

মায়া চলে গেলে নীলেন্দু বলল, "তোরা সেই লিলুয়ার বাড়িতেই আছিস?"

"ছিলাম। আজ সকালে সকলেই পালিয়ে এসেছি। সমর তারকেশ্বরের দিকে যাবে বলল, আর মানু হাওড়া স্টেশনে এসে বর্ধমান লোক্যাল ধরল।"

"তুই সেই তখন থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছিস?"

বুলবুল চায়ে চুমুক দিল, নিতান্তই অভ্যেসবশে যেন, তার তৃষ্ণা বা রুচি কিছুই ছিল না। বলল, "আমি পদ্মপুকুরে গিয়েছিলাম একবার, আমার পিসতুতো এক দিদি থাকে, সেখান থেকে বেরিয়ে দুপুরবেলা রঞ্জিৎদাকে ফোন করলাম। রঞ্জিৎদা বিকেলে ধর্মতলা স্ট্রিটে দেখা করতে বলল। সে সব শুনে বলল, তোমার কাছে আসতে।"

নীলেন্দু অনেকক্ষণ থেকেই ভাবতে শুরু করেছিল। ভাবনা অনেক সময় উনুনের ধোঁয়ার মতন শুধু ফেনিয়ে ওপরে ওঠে, তার সমস্তটাই আকারহীন,এলোমেলো, বিরক্তিকর। নীলেন্দুর ভাবনাও কোনো বিশেষ আকার পাচ্ছিল না। সে চা খেতে খেতে সিগারেট ধরাল। একেবারে চুপচাপ। গম্ভীর। কিছু একটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল মনে মনে।

"বিজু আমাদের এমন করে ফাঁসিয়ে যাবে ভাবি নি নীলেন্দুদা—" বুলবুল বলল, "ওর মাথায় কি করে যে এই ব্যাপারটা এল! এখন তো পুলিসের একেবারে খপ্পরে পড়ে গেলাম আমরা তিন জনেই…। বিজু আমাদের সকলকে ডেন্‌জারাস পজিসনে ফেলে দিল।"

অন্যমনস্কভাবে নীলেন্দু জিজ্ঞেস করল, "বিজু কিছু লিখে গিয়েছে ?"

"কি জানি ! আমরা ভাল করে খুঁজে দেখি নি। ব্যাপারটায় এ-রকম নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম যে সঙ্গে সঙ্গে তিন জনেই বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছি।"

"বাড়িতে কিছু নেই তো ?"

বুলবুল তাকাল। ছোট করে বলল, "না ; ওসব নেই।"

নীলেন্দু কি যেন ভাবল, "তোরা নাকি কোন রেল কলোনির বাড়িতে থাকতিস ?"

"না ; আমরা একটা আধ-পোড়ো বাড়িতে থাকতাম—"বুলবুল বলল কেউ তৈরী করতে করতে আধখাপচা করে ফেলে রেখে গিয়েছিল। ওদিকটা ডিস্টার্বড ছিল খুব ; এখনও লোকজন কম। একটা কাচ কারখানা আছে কাছাকাছি···।"

"কারখানায় মানু কাজ পেয়েছিল না ?"

"নাম ভাঁড়িয়ে একটা কাজ করত···"

"সমর ?"

"ও মাঝে মাঝে কলকাতায় এসে কিছু টাকা পয়সা যোগাড় করে নিয়ে যেত।"

"তুই কিছু করতে পারিস নি ?"

"না।"

নীলেন্দু বাকি চাটুকু খেয়ে ফেলল এক ঢোঁকে। বুলবুলের দিকে অকারণে তাকাল। চোখ ফিরিয়ে নিল আবার। ছেলেটা যে অসুস্থ বোঝাই যায়। জণ্ডিসে ধরেছে নাকি ? চেহারা দেখে মনে হয়, টি বি-তেও ধরতে পারে। আশ্চর্যের কি আছে, ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দিন কাটাচ্ছে কতদিন ধরে, খেতে পায় কি পায় না অর্ধেক দিন, যা পায় তাতে হয়ত পেট ভরে না, দিনের পর দিন আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে, ঘুম নেই, গায়ে জামাকাপড় ও জোটে না, কোনো রকমে নিজেকে টিকয়ে রেখেছে।

নীলেন্দু বলল, "তোর কি অসুখবিসুখ করেছে ?"

বুলবুল অস্বীকার করল না, বলল, "পেটে একটা ব্যথা হয়, জ্বরও হয় মাঝে মাঝে। সব সময় কেমন গা-বমি গা-বমি লাগে।"

"দেখ আবার আলসার-টালসার হল কিনা !···যাক্‌গে, এখন আমায় কি করতে হবে বল্‌।"

বুলবুল অদ্ভুত মুখ করে বলল, "তুমি আমায় কোথাও থাকার ব্যবস্থা করে দাও। যেখানে হোক্—কলকাতায় নয়—বাংলা দেশের বাইরে যেতেও আমি রাজী।"

নীলেন্দু অপলকে বুলবুলকে দেখতে লাগল। বেচারীর সমস্ত মুখ এমন দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন এই মুহূর্তে সে কোথাও পালিয়ে যেতে পারলে বেঁচে যায়।

কি করা যায় নীলেন্দু ভাবতে লাগল। কলকাতায় এক-আধটা দিন হয়ত বুলবুলকে রাখা যায়, কিন্তু তাতে ছেলেটা স্বস্তি পাবে না। পুলিসের ভয় আর তাড়া থেকে বাঁচবার জন্যে সে কোনো নিরাপদ জায়গায় যেতে চায়। বিজুর আত্মহত্যার পর পুলিস যে ওই বাড়িটার বাকি তিন জনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। বুলবুলদের যথার্থ পরিচয় জানতে বেশী সময় লাগবে না।

নীলেন্দু বলল, "আজ রাত্রে তুই কোথায় যাবি ? এখানেই থেকে যা।···দেখি, ভেবে দেখি—কি করা যায়।"

বুলবুল শূন্য চোখে নীলেন্দুর দিকে তাকিয়ে থাকল।

আরও খানিকটা রাত্রে নীলেন্দু আর বুলবুল অন্ধকার ছাদে আলসের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আকাশের সেই একফালি চাঁদ মেঘের আড়ালে চলে গেছে। এখন আকাশে ভাঙা ভাঙা মেঘগুলো আবার যেতে শুরু করেছে। হয়ত মাঝরাতে বৃষ্টি নামতে পারে।

বাতাসটা ঠাণ্ডা। বুলবুল সারাদিন পরে এ-বাড়িতে স্নান করতে পেরেছে। খাওয়া-দাওয়া সেরেছে। অবশ্য তার খিদে মরে গিয়েছিল,

তবু বাড়ির রান্না খেয়ে তার চোখে হঠাৎ জল এসে পড়ছিল, অনেক কষ্টে সামলে নিয়েছে। খেতে বসে বুলবুল একটা জিনিস বেশ লক্ষ করেছে। নীলুদা একেবারে গম্ভীর, মুখ নীচু করে তাড়াতাড়ি খাচ্ছিল, যেন ব্যাপারটা চুকিয়ে উঠে পড়তে পারলেই বাঁচে। নীলুদার কাকিমারা কিছু না বললেও বুলবুলকে যে অন্য চোখে নজর করছে সেটাও সে বুঝতে পারছিল। হয়ত নীলুদার এই সব চেনাজানা ছেলেদের ব্যাপারটা বাড়ির লোক জানে।

অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বুলবুল সারা দিনের ক্লান্তি, উৎকণ্ঠা, ভীতির ভার অনুভব করতে করতে শব্দ করে হাই তুলল।

নীলেন্দু কখনো আকাশ দেখছিল কখনও কাছাকাছি বাড়ির ছাদের ভাঙাচোরা চেহারা। আসলে সে কিছুই দেখছিল না, ভাবছিল। ভাবছিল, বুলবুলকে কোথায় পাঠানো যায়? পাকুড়ে জয়ার এক দেওর থাকে, কিন্তু সে তেমন বিশ্বস্ত নয়। আসানসোলে গোপীজীবন থাকে, সে এ ধরনের ঝামেলা ঘাড় পেতে নিতে চাইবে না।

কোথায় পাঠানো যায় বুলবুলকে? মহীদার কাছে? কিন্তু...।

নীলেন্দু হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "তুই মহীদার নাম শুনেছিস?"

"কে মহীদা?"

"শুনিস নি?"

"না। সে কে?"

"তুই চিনবি না।...যাক্ গে, কলকাতায় এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে চার-পাঁচটা দিন থাকতে পারিস?"

"না।"

"হুট্ করে কোথাও পাঠাবার আগে একবার জেনে নিতাম..."

"আমার কোথাও থাকার জায়গা নেই, নীলুদা!...কি রকম অবিচার দেখো! আমি কিছু করি নি, আমি আর মানু একেবারে ইনোসেন্ট, আমরা কোনোদিন একটা খারাপ কিছু করিনি—শুধু ওদের

সঙ্গে মেলামেশাই ছিল, তাতেই পাড়া রেড্ করার সময় আমাদের তাড়া করল। কুকুরের মতন সব তেড়ে এল, পাড়ার লোক আর পুলিশ। না পালিয়ে কি করব! তারপর মাসের পর মাস লুকিয়ে দিন কাটাচ্ছি। বিস্টুটা আত্মহত্যা করে আরও ফাঁসিয়ে দিল…।"

নীলেন্দু কিছু বলল না। সে জানে। বুলবুল তো একা নয়, এ-রকম অজস্র রয়েছে, জেলে পচছে, লুকিয়ে লুকিয়ে দিন কাটাচ্ছে। নীলেন্দু ক'জনকে আর চেনে। বুলবুলকেও তার চেনার কথা নয়, তাদের পুরো দলটাকেই নীলেন্দু আগে চিনত না; চিনেছে পরে, অনেক পরে।

নীলেন্দু বলল, "চল্ শুবি চল্, আমি একটু ভেবে নিই।"

## দশ

নীলেন্দুর ঘুম আসছিল না। রাত ঠিক কত বোঝা যায় না, হয়ত দেড়টা দুটো হবে, একপশলা পাতলা বৃষ্টি হয়ে থেমে গেছে, বাতাস ভিজে, আবার কোনো সময়ে ঝপ করে বৃষ্টি এসে যেতে পারে।

বুলবুল ঘুমোচ্ছে। মাটিতে। নীলেন্দুর খাট দুজনের শোবার মতন নয়, সে অবশ্য বুলবুলকে খাটে শুতে বলে মাটিতে একটা সতরঞ্জি আর ময়লা চাদর বিছিয়ে নিয়েছিল শোবার জন্যে—কিন্তু বুলবুল কিছুতেই খাটে শুতে রাজী হল না, মাটিতে শুয়ে পড়ল। ছেলেটা সারাদিন এত ছোটাছুটি করেছে, ভয়ে বিহ্বলতায় এমনই দিশেহারা হয়ে ছিল যে শোবার খানিকটা পরেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আসলে তার শরীর মন আর তাকে টানতে পারছিল না। বুলবুলের নিশ্চিন্ত ঘুম দেখে নীলেন্দুর মনে হচ্ছিল, ছেলেটা যেন তার সমস্ত দায় দুশ্চিন্তা নীলেন্দুর হাতে সঁপে দিয়ে নির্ভার হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

নীলেন্দু নিজে ঘুমোতে পারছিল না। বুলবুলকে কোথায়

পাঠানো যায় ভাবতে ভাবতে তার মাথা ভার হয়ে উঠল। কোনো জায়গা সে খুঁজে পেল না। আজকাল জায়গা পাওয়া মুশকিল, সবাই সাবধান হয়ে গেছে, পুলিসের ভয়, পাড়ার ছেলেদের ভয় তাদের ভীষণ সাবধান করে দিয়েছে। যে রঞ্জিৎ বুলবুলকে নীলেন্দুর কাছে পাঠাল—সেই রঞ্জিতেরই একসময় কত জানাশোনা ছিল, আজ সে আর কাউকে বিশ্বাস করে না, তার সাধ্যে কিছুই আর কুলোয় না।

কিন্তু নীলেন্দুই বা বুলবুলকে কোথায় পাঠাবে? তন্নতন্ন করে খুঁজেও কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। এক মহীদার কাছে বুলবুলকে পাঠানো যেতে পারে। পারে মানে উপায় নেই বলেই পাঠানো যায়। নীলেন্দু নিজে যে এটা পছন্দ করছে তা নয়, কেননা মহীদা বা দেবীদি ব্যাপারটা ভাল মনে নেবে না, তারা মনে করবে—নীলেন্দু জেনে-শুনেও তাদের ঘাড়ে একটা বিপদজনক ঝুঁকি চাপিয়ে দিল। হয়ত অন্য কিছুও ভাবতে পারে—যেমন দেবীদি ভাবতে পারে—নীলেন্দু ইচ্ছে করেই তাদের কোনো খুঁটির সঙ্গে জড়িয়ে রাখার চেষ্টা করেছে।

নীলেন্দু কিন্তু তা করছে না। মহীদারা যেমন খুশি থাকুক, যা ভাল লাগে করুক—তাতে তার কোনো আগ্রহ নেই। বুলবুলকে পাঠানোর মধ্যে নীলেন্দুর কোন উদ্দেশ্য সত্যিই নেই, স্বার্থও নেই, নেহাতই দায়ে পড়ে পাঠাতে চাইছে।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে মন এলোমেলো হয়ে গেল নীলেন্দুর। নানা ধরনের বিক্ষিপ্ত চিন্তাই তাকে ক্রমশ অস্থির করে তুলল। এসব ক্ষেত্রে নিজের কথা না ভেবে পারা যায় না। এবং ভাবতে গেলে মনে হয় কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি যেন নীলেন্দুকে দেখছে।

কোনো সন্দেহ নেই, আজকাল নীলেন্দুর মধ্যে প্রচুর হতাশা এসে জুটেছে ; বেশ বুঝতে পারছে—কিছু হল না, কিছুই করা গেল না। হয়ত তার পক্ষে কোনো কালেই কিছু করা সম্ভব ছিল না, সে নিজেকে

যা ভাবত প্রকৃতপক্ষে সে তা নয়। এমন একটা সংসারে নীলেন্দু জন্মেছিল যে-সংসারে তার অনাদর হয় নি, কেউ তাকে উপেক্ষা করে নি; বরং বাল্যকাল থেকেই সে এই সরল বিরাট পরিবারের স্নেহ ও যত্ন পেয়ে এসেছে। তার অভিযোগ করার, ক্রুদ্ধ হবার, ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠার বাস্তবিক কোনো কারণ ছিল না। সে চিরকালই মোটামুটি ধরনের ছেলে, মাথা এমন কিছু সাফ নয়, একটু বেশী উচ্ছ্বাসপ্রবণ। ছেলেবেলা থেকেই তার শরীর স্বাস্থ্য স্বাভাবিক ও মজবুত ছিল। পাড়ার হাবুদার চেলা হয়ে সে লাহা-বাড়ির পোড়ো জমিতে ফুটবল খেলতে শুরু করে। বছরের পাঁচ-সাতটা মাস এই করেই কেটে যেত। স্কুলে নীলেন্দুর নাম হয়ে গেল, স্কুল টিমে খেলতে খেলতেই তার ওপর নজর পড়ে গেল পাশাপাশি পাড়ার এক বড়দের ক্লাবের। তারা নীলেন্দুকে ডেকে নিল। এখন এসব কথা ভাবলে কেমন যেন লাগে, হাসি পায়। তখন যে ছেলের একমাত্র সাধ ছিল খেলোয়াড় হবার, সে পরে খেলার মাঠ বরাবরের জন্যে ছেড়ে দিল। শুধু খেলা নয়, নীলেন্দুর সামনে ধরাবাঁধা জীবনের যে ছকটা ছিল সেটাও এড়িয়ে গেল। বড় হবার পর তার সামনে বাবার ব্যবসা, ছোটকাকার ওকালতি, দাদা আর শুভেন্দুর মতন চাকরি বা ছোটখাট কনট্রাকটারি খালি পড়ে ছিল। সে সবই হতে পারত। বাবার সঙ্গে ব্যবসায় গিয়ে বসলে বাবার অশান্তি দূর হত, মেজোকাকা বেঁচে যেত, ছোটকাকা খুশী হত। শুধু তাই নয়, এই পরিবারের প্রায় প্রত্যেকই একটা দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচত। ওই ছকে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলে আজ নীলেন্দুর দিব্যি জীবন কেটে যেত। এতদিনে বিয়েথা করে ছেলেমেয়ের বাপ হয়ে বসাও বিচিত্র ছিল না। কিন্তু যেটা হওয়া উচিত ছিল সেটা হল না। অন্যরকম হয়ে গেল।

কেমন করে হল সেটা অন্য প্রশ্ন, কিন্তু এর জন্যে নীলেন্দু কাউকেই দায়ী করে না। কলেজে তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল মুকুল। মুকুল এত ভদ্র, শান্ত, বিনীত ছেলে ছিল যে তাকে ভাল না বেসে পারা যায়

না। লেখাপড়াতেও ভাল ছিল। সেই মুকুল একদিন কলেজ ইউ-নিয়নের ছেলেদের হাতে রাস্তার মধ্যে মার খেল। কারণ সে ইউ-নিয়নের ছেলেদের কি একটা মিছিলের মধ্যে থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। কেন মুকুল মিছিলে যাবে না—এই অপরাধে কটা ছেলে তাকে মেরে মুখ চোখ ফুলিয়ে দিল। নীলেন্দু ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। তোমরা জোর করে মিছিলে ধরে নিয়ে যাবে, না গেলে মারবে! আচ্ছা শালা দেখি। ইউনিয়নের তখন বেজায় শক্তি; কলেজ বলতে ইউনিয়ন, প্রায়ই মারপিট বোমা মারামারি আর স্ট্রাইক চলছে। একদিন একটা ছেলে কলেজের সামনে রাস্তার কোন মেয়েকে টিটকিরি দিতে গিয়ে মার খেল। সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়নের যত ছেলে কলেজ বন্ধ করে পাড়ার লোকের সঙ্গে মারপিট করতে বেরুলো। পুলিস এসে কয়েক জনকে ধরল, ছেলেরা চলল থানা পর্যন্ত মিছিল করে। মুকুল গেল না, নীলেন্দুকে বলল, 'চল,—আমার বাড়িতে চল, আড্ডা মারব।'

এই মুকুলই সেদিন বলল, 'নীলু, এ-সব আর বেশীদিন চলবে না; এই মোড়ল মার্কা ছেলেগুলো অসহ্য।'

মুকুল যে তলায় তলায় অশান্ত, অধীর, ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে নীলেন্দু প্রথমে বুঝতে পারে নি। পরে যখন বুঝল তখন আর সে কোথাও কোনো দোষ দেখতে পেল না।

মুকুল, রবি, কৃষ্ণকমল—এদের দলে ক্রমশই ভিড়ে পড়তে লাগল নীলেন্দু। ভিড়ে পড়ার পর সে ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারল, যে-জগৎ সম্পর্কে তার কেমন একটা নিশ্চিন্ত ধারণা ছিল সে-জগৎ অত সাদামাটা নয়। নীলেন্দুর মনে খটকা লাগলেও সে সরাসরি কোনো কিছুতে মেতে ওঠে নি। তবু মুকুলদের তার ভাল লাগত। বি. এ. পরীক্ষার বছরে নীলেন্দু পরীক্ষা দিতে পারল না, টাইফয়েডে পড়ল। পরের বছর পরীক্ষা দিল। মুকুলরা তখন ইউনিভার্সিটিতে। কৃষ্ণকমল চাকরি করছে।

নীলেন্দু ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছিল। কিন্তু পড়াশোনায় আর মন

পাচ্ছিল না। রবি হুট্ করে বাস অ্যাকসিডেণ্টে মারা গেল। মুকুল আশ্চর্য রকমে পালটে গিয়েছিল। তার চারদিকে কেমন যেন এক রহস্য, তার কিছু নতুন বন্ধুবান্ধব হয়েছে, তার মুখচোরা, লাজুক, নম্র ভাব আর নেই। ইউনিভার্সিটির মধ্যে এক হামলার পর মুকুল হঠাৎ পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে কোথায় চলে গেল।

নীলেন্দুরও আর ভাল লাগছিল না। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ত অথচ ইউনিভারসিটি যেত না। দেবীদির চোখে ধরা পড়ল। বলল, আমার ভাল লাগে না, কি হবে এই লেখাপড়া শিখে।

এই সময় নীলেন্দু মহীতোষের কাছে আসাযাওয়া শুরু করেছিল। মুকুলই একবার টেনে নিয়ে গিয়েছিল নীলেন্দুকে মহীদার কাছে।

এক একজন মানুষ থাকে—যাদের প্রথম থেকেই ভাল লেগে যায়। মহীদা ছিল সেই রকম মানুষ। তার কথাবার্তা, ব্যবহারের মধ্যে কেমন এক আকর্ষণ ছিল যা টেনে নেয়। নীলেন্দু মহীদার খুব বড় একজন ভক্ত হয়ে উঠল।

হঠাৎ খবর শোনা গেল মুকুল জলপাইগুড়ির দিকে চা-বাগানে ছিল —খুন হয়ে গিয়েছে। খবরটা নীলেন্দুর বড় লেগেছিল।

এরপর সব কেমন ওলটপালট হয়ে যেতে লাগল। এই বাংলাদেশে না ঘটল এমন কিছু নেই, নাগরদোলার দোলনার মতন এ একবার মাথায় চড়ে তারপর হু হু করে নেমে আসে, অন্যজন মাথায় চড়ে। সমস্ত কিছু বিশৃঙ্খল, চারদিকে অরাজকতা, খুনের পর খুন।

মহীদা বলত, এটা কোনো রাজনীতি নয়, স্বার্থনীতি: ক্ষমতায় বসে থাকার জন্যে স্বৈরাচার। কংগ্রেস একচ্ছত্র অধীশ্বর হয়ে বছরের পর বছর যেভাবে গোঁজামিল দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছিল—এরাও সেই গোঁজামিলের শরিক।

'তুই ভাল করে ভেবে দেখ নীলু,' মহীদা বলত, 'পশ্চিমবাংলার হাল কোথায় এসে দাঁড়াল। আজ এখানে সবচেয়ে বেশী বেকার, শিক্ষিত অশিক্ষিত বলে কোনো কথা নেই, কর্মক্ষম যত মানুষ আছে

এই স্টেটে তার শতকরা বিশ ভাগকেই আমি হয় পুরো বেকার না-হয় হাফ্ বেকার বলব। কেন? এই বিশ-বাইশ বছর ধরে তা হলে কি হল? জমিদারী উচ্ছেদ কাগজকলমে হল—কিন্তু জমিদার আর জোতদারদের লবি গভর্ণমেন্টকে ঠুঁটো করে রাখল, আজও গ্রামের মানুষের সেই একই অবস্থা। ইন্ডাসট্রি বাড়াবারই বা কতটুকু হয়েছে? এক সময়ে এই পশ্চিমবাংলায় ইন্ডাসট্রিয়াল গ্রোথ্ ছিল সবচেয়ে বেশী, এখন নামতে নামতে তলিয়ে যাবার অবস্থা। কেন? আমাদের যারা কর্তা হয়ে বসে আছে মাথার ওপর তারা ওয়ার্থলেস, তাদের কিছু করার গরজ নেই, ক্ষমতা নেই, দূরদৃষ্টি নেই, কোনো রকমে মিনিস্ট্রি হাতে করে বসে থাকার ধ্যান ছাড়া কিছু করে নি। তারপর যারা এল, তারা আরও ওআর্থলেস, মানুষের জন্যে কিছু করবে বলে আসে নি, কোনো বড় আদর্শ নিয়েও আসে নি, এসেছিল কোনো ফিকিরে ক্ষমতা দখল করে নিতে। তার ফলাফল কি হয়েছে—তা তো দেখতেই পেলি, মারপিট খুনোখুনি, একে অন্যের গায়ে থুতু ছিটোনো, গুণ্ডা বদমাশদের পেট্রনাইজ করা···তাতেই দিন ফুরিয়ে গেল। এভাবে কিছু হয় না, হতে পারে না।'

নীলেন্দু চোখ বন্ধ করে ছিল না, সবই দেখতে পাচ্ছিল—ঠিক যেভাবে ধীরে ধীরে ভেতরের চাপা ব্যাধি শেষ পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়ে, সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে যায়—ঠিক সেইভাবে চরম হতাশা ক্ষোভ, ক্রোধ, অবজ্ঞা, অবিশ্বাস সমাজের সর্বদিকে ছড়িয়ে গেল। নীলেন্দু নিজেই কখন তার মধ্যে জড়িয়ে পড়ল। মহীদাও সেই একই ব্যর্থতার শিকার।

একদিন মহীদা বলেছিল, দেবীদির সামনেই, 'দেখ নীলু, আমি জন্ম কাল থেকেই আবর্জনার মধ্যে বেড়ে উঠেছি। আমার বাবা নমস্য চরিত্রের মানুষ ছিল না। মাকে ভাল লাগার মতনও কিছু আমার ছিল না। নতুন মা, কিংবা ধর বাবার দ্বিতীয় স্ত্রী ছোটমাও ভাল ছিল না। আমি অনাদর, অবহেলার মধ্যে বড় হয়ে উঠেছি। এসব ক্ষেত্রে যেমন হয়, ঘৃণা ও রাগের বেশী কিছু থাকে না, এই সমাজের মানুষের

মনে ঠিক সেই রকম অথারিটির বিরুদ্ধে ঘৃণা ছাড়া কিছু নেই। রাগ ঘৃণা, অবজ্ঞার বেশী তুই কিছু পাবি না। আমি হয়ত ব্যক্তিগত ব্যাপারটা কোনো রকমে সামলে নেবার চেষ্টা করি, কিন্তু সকলের কাছে সেটা আশা করা যায় না।'

নীলেন্দু স্পষ্টই বুঝতে পারছিল, মানুষের সহ্যশক্তি শেষ হয়ে এসেছে। তারা রাম বা শ্যাম কারও কর্তৃত্বই আর মানতে রাজী না। যদি কোনো দলের মধ্যে নাম লিখিয়ে থাকো তবে ঠাকুরদেবতায় বিশ্বাসের মতন সেই দলের নেতাদের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে পার, মিছিল করতে পার, ইউনিয়ন করতে পার, ঘেরাও করতে পার—আর কিছু করতে পার না। এও এক ধরনের সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি, অনেক ক্ষেত্রে বর্বরতা।

তা হলে?

মহীদার কাছে যারা আসত তারা এর কোনো জবাব পেত না। কেননা মহীদার কোনো জবাব জানা ছিল না। যখন মন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, জ্বালা ধরে থাকে সর্বাঙ্গে, তখন শুধু কথা দিয়ে কাউকে শান্ত রাখা যায় না। নিষ্ক্রিয়তা কোনো কিছু দেয় না। মহীদা নিষ্ক্রিয় ছিল, বা থাকতে চেয়েছিল বলেই অনেকে নরেনবাবুর দলে যাতায়াত করতে লাগল, কিংবা বলা যায়—তারা সেখানে সক্রিয় হবার সম্ভাবনা দেখতে পেল।

তারপর দেখতে দেখতে যেন আগুন ধরে গেল।

মহীদা প্রথমটায় কি ভেবেছিল কে জানে কিন্তু অখুশী হয়েছিল। বলেছিল, এটা কি হচ্ছে? পোস্টার দিয়ে বিপ্লব হয়, মানুষ খুন করে বিপ্লব? আমি এসব বুঝি না। আমার দেশ আমারই—তার জন্যে বাইরে থেকে মহাপুরুষ ধার করে এনে তাকে দেবতা করতে হবে?

কিন্তু মহীদার সাধ্য ছিল না, বানের জল আটকে রাখার। দেখতে দেখতে মহীদা প্রায় নিঃসঙ্গ হয়ে গেল, কয়েকজন ঘনিষ্ঠ ছাড়া আর কেউ আসত না তার কাছে। নরেনবাবুর ছেলেরা মহীদাকে গালাগাল দিত,

ঘৃণা করত, বলতঃ শালা দালাল, নপুংসক।

এই সময় একদিন মহীদার জানাশোনা একজন কান্তি, নরেনবাবুদের দলের সঙ্গে যার যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ, মির্জাপুর স্ট্রিটের কাছে এক খুনের মধ্যে ছিল। খবরটা মহীদার কানে পৌঁছতেই মানুষটা একেবারে খেপে গেল।

পরের দিন মহীদা শুভঙ্করদের সঙ্গে দেখা করল। সেখানে শুভঙ্কর অজয়, পল্লব, সিধু, গগনরা ছিল। নীলেন্দুও। কান্তি ছিল না।

মহীদা কান্তির কথা তুলে বলল, এ সবের মানে কি?

শুভঙ্কর বলল, 'কান্তিকে আপনি দোষী করতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ, চাইছি।···মিষ্টির দোকানে বসে বাবা আর ছেলে খাবার খাচ্ছিল, কথা বলছিল, ছেলেটাকে দোকান থেকে বের করে এনে যারা তাকে খুন করেছে তার মধ্যে কান্তি ছিল।'

অজয় বলল, 'যদি থেকেও থাকে তাতে আপনার কি? আপনি জানেন—ওই ছেলেটা ইনফরমার?'

'খাকি পোশাক পরলেই ইনফরমার হয়? তুমি জানো ও রেলের অফিসে খালাসীর কাজ করত?'

'ওকে আপনি চেনেন, না বুর্জোয়া কাগজের খবরে পুলিসের তরফ থেকে যে গল্প বেরিয়েছে সেই গল্প বলছেন?'

'গল্প তোমরা বলছ! তোমাদের নরেনবাবুর ছেলেরা গল্প শোনাচ্ছে।···শোনো, আমি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছি তোমরা সকলেই বোধ হয় উনিশবিশ নরেনবাবুর কথামতন বিপ্লব করতে চাও। তোমরা মনে করছ, কোনো রকম ছুতো তৈরী করে মানুষ খুন করার স্ট্র্যাটিজি নিয়ে টেরার তৈরী করবে। তোমাদের এই বিপ্লব আর মানুষ খুনের সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক আমি রাখতে চাই না। যা খুশি তোমরা করো, আমার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক তোমাদের নেই।'

নীলেন্দু বুঝতে পারে নি, অজয় আর পল্লব আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল—মহীদাকে তারা আজ অপদস্থ করবে। বোধহয়

নরেনবাবুদের কেউ সেই রকম পরামর্শ দিয়েছিল। ফলে অজয় আর পল্লব মহীদাকে অবজ্ঞা অপমান করতে লাগল। কোনো রকম সৌজন্য থাকল না, সঙ্কোচ রাখল না।

বিশ্রী রকম ঝগড়ার মধ্যে অজয় বলল, 'আপনার যদি মরার ভয় থাকে আপনি বাড়ি ফিরে যান, খাওয়াপরার অভাব তো নেই, আপনাকে আগলে রাখার মানুষও রয়েছে, আমাদের কিছু নেই, আমরা কারও পরোয়া করি না। যা দেখছেন, এই হবে, আরও হবে—আপনার মতন লোকের পক্ষে তা সহ্য করা সম্ভব হবে না।...'

মহীদা হঠাৎ জ্ঞান হারাল, প্রায় লাফ মেরে গিয়ে হাত ধরল অজয়ের, বলল, 'তুমি সাহস দেখাতে চাও, বিপ্লবী হতে চাও, চলো—বড় রাস্তার মোড়ে একটা পুলিস ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। দুটো সার্জেন্ট গোছের পুলিসকে দেখেছি চায়ের দোকানের সামনে, হয়ত চা-কা... চলো, খুন করে আসবে চলো। তারাও তো তোমাদের শোষণ আর নিপীড়ন যন্ত্রের প্রতীক।

অজয় ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নেবায় চেষ্টা করল, খেপে গিয়ে বলল, 'হাত ছাড়ুন; ছেলেমানুষি করবেন না।'

'ছেলেমানুষির কি হল?'

'পুলিস খুন যদি আমাকে করতেই হয়—আমি করব, তবে নিশ্চয় বোকার মতন নয়।'

'তার মানে তুমি বুদ্ধিমানের মতন খুন করবে, অর্থাৎ যখন রাস্তাঘাটে বেমক্কা কাউকে পেয়ে যাবে—যে তোমাদের কলেকটিভ্ আক্রমণটা বুঝবে না। একে তোমরা সাহস বলো, বিপ্লবীর দুর্জয় কীর্তি বলো!...কিন্তু যে বা যারা দল বেঁধে লুকিয়ে একটা লোক মারে, তার সাহসটা কোথায়? লুকোনোর মধ্যে? না সুযোগ খোঁজার মধ্যে? যারা সুযোগ খুঁজে বেড়ায়, যারা লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ সেরে ফেলতে চায়—তারা ভবিষ্যতে কোন্ মেরুদণ্ড নিয়ে সামনাসামনি আসবে আমায় বলতে পার?'

পল্লব ব্যঙ্গ করে বলল, 'আপনি নিজের মেরুদণ্ড দেখুন, আমাদের মেরুদণ্ড দেখবার দরকার নেই।'

অজয়ের হাত ছেড়ে দিয়েছিল মহীদা। পল্লবদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের যে মেরুদণ্ড আমি দেখলাম তাতে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। বলতে লজ্জা করে, তোমাদের মেরুদণ্ডটাও যদি নিজের হত···। যাক গে, তোমরা খুনখারাপি করে বেড়াও গে যাও, তোমাদের বিপ্লব তোমাদের হোক, আমি আর কারুর সঙ্গেই কোনো যোগাযোগ রাখতে চাই না।···আমায় ভয় দেখাবার চেষ্টা করো না। তাতে সুবিধে হবে না। তা ছাড়া আমি বুঝতে পেরেছি, তোমাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বই বলো আর যাই বলো তার কোনো অর্থ নেই। তোমরা অন্য ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছ।'

মহীদা সেদিনই এই মেলামেশা যোগাযোগ বরাবরের মতন বন্ধ করে দিল।

নীলেন্দু প্রথম দিকে খানিকটা নিশ্চল হয়ে পড়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে শুভঙ্কর, গগন এরা কেউই খুনটুনের দিকে যায় নি। হয়ত অজয় কিংবা পল্লবও যেত না। নরেনবাবুর দিকে যারা টলে গিয়েছিল বা যাচ্ছিল তাদের বাদ দিয়েও কিছু ছেলে তো ছিল—মহীদা কেন তাদের কথা ভাবল না?

বোধ হয় ভাবা সম্ভব ছিল না। মহীদা বিশ্বাস করতে পারে নি, মানুষ খুন করা, স্কুল পোড়ানো, কলেজের লাইব্রেরী বা ল্যাবরেটরী তছনছ করা, যত্রতত্র কালাপাহাড়ী কাণ্ড করে বেড়ানো সকলে মেনে নেয় নি। গগনদের পাড়ায় যেদিন নামকরা একটা মেয়ে স্কুলের বাস পুড়িয়ে দিল কয়েকটা ছেলে মিলে আর কচি মেয়েগুলো ভয়ে অলিগলির মধ্যে ছোটাছুটি করতে লাগল সেদিন গগন পাড়ার সেই ছেলেগুলোকে বলেছিল: এ-রকম ঘটনা আর যদি আমাদের পাড়ায় ঘটে আমি তোমাদের দেখে নেব।

আসলে, যা কিছু ঘটেছিল এতো তাড়াতাড়ি ঘটে যাচ্ছিল, নানা

দিক থেকে গোপনে এতো রকমের বেনো জল ঢুকছিল, গুজব আর রটনা এমন করে ছড়িয়ে পড়ছিল যে সত্যিসত্যি কি ঘটছে তা জানা যেত না। স্বার্থপরতা, বিদ্বেষ, ক্ষমতার লোভ—সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছিল। নীলেন্দু নিজেই অবাক হয়ে ভাবত, এই কি তাদের কাম্য ছিল? তবে?

মহীদা আর দেবীদি তার আগেই কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে। নানা ধরনের গুজব রটেছিল প্রথমে। কেউ কেউ বলত, দেবীদি মহীদাকে নিয়ে দিল্লি পালিয়ে গিয়েছে, কেউ বা বলত—মহীদা পুলিসের কাছে ইনফরমেশান সাপ্লাই করে পালিয়ে গিয়েছে, কারও কারও ধারণা হয়েছিল—মহীদা তার চরিত্র অনুযায়ী কাজ করেছে, মধ্যবিত্ত চরিত্র যা হয়, বিশ্বাসঘাতক।

নীলেন্দু সবই শুনত, ভাবত, বুঝতে পারত না। তার মনে হয়েছিল দেবীদি অনেকদিন ধরেই মহীদাকে এই বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে থেকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, বোধ হয় দেবীদিই যা চাইছিল তাতে সফল হয়েছে।

নীলেন্দুর এটা ভাল লাগে নি। ভাল লাগে নি এই জন্যে যে, মহীদা শুধু নিজেকে হাস্যাস্পদ করে নি, তার আরও কয়েক জন বন্ধু ও অনুগতকে বিশ্রী অবস্থায় ফেলে গেছে। যারা নরেনবাবুদের কাজকর্ম পছন্দ করত না তারা প্রায় অক্ষম হয়ে গেল।

দেখতে দেখতে আবার সব পালটে গেল। যারা চারদিকে আতঙ্ক আর উদ্বেগ সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছিল তারা খুন হল, জেলে গেল, অসংখ্য ছেলে দল পালটে ফেলল, পাড়ায় পাড়ায় নির্বিচার ধরপাকড় উইচ হাণ্ট, এক-একটা পাড়ায় তো রীতিমত রক্তগঙ্গা বয়ে গেল।

তাহলে?

নীলেন্দু আজ বেশ বুঝতে পারে, কিছুই হল না। খড়ের আগুনের মতন যা জ্বলে উঠেছিল তা নিবে গিয়েছে। এখন শুধু ছাই উড়ছে। কোথাও কোথাও পোড়া খড়ের তলা দিয়ে কিছু উত্তাপ।

নীলেন্দু বুঝতে পারে না, এই রকমই কি হওয়া স্বাভাবিক ছিল, নাকি যা হয়েছে তা নিজেদের অদূরদর্শিতা অপরিষ্কার ধারণা ও জেদের জন্যেই হয়েছে? এই ভুলের মাশুল কে গুনছে? কারা?

সকালে ঘুম থেকে উঠে বুলবুল দেখল নীলেন্দু টেবিলের সামনে পিঠ নুইয়ে বসে বসে কি লিখছে।

উঠে বসে বুলবুল বলল, "কি করছ?"

"চিঠি লিখছি।"

বুলবুল জানলার দিকে তাকাল। সকাল হয়েছে, কিন্তু রোদ ওঠে নি, হয়ত মেঘলা হয়ে আছে আকাশ। কতটা বেলা হয়েছে বোঝা মুশকিল।

বুলবুল বলল, "কটা বেজেছে নীলুদা?"

"ছটা হবে।...তুই নীচে চলে যা—একেবারে নীচে, বাইরের কলে মুখ ধুয়ে আয়, ঘরের ওদিকে দেখ—পেস্ট আছে।"

বুলবুল উঠে পড়ে বিছানাটা গুটিয়ে নিল।

"তুমি কি ঠিক করলে?"

"আজ রাত্রে তোকে এক জায়গায় পাঠিয়ে দেব।"

"কোথায়?"

"তা এখন জেনে তোর লাভ নেই।"

বুলবুল আর কিছু বলল না। ঘরের মধ্যে সামান্য পায়চারি করল, ছাদে গেল, আবার ঘুরে এসে বলল, "নীচে সকলে জেগে উঠেছে।"

"তোকে তো বললাম একেবারে নীচে নেমে যাবি। বাইরে একটা কল আছে...।"

বুলবুল খুঁজেপেতে একটু পেস্ট নিল আঙুলে, তারপর চলে গেল।

নীলেন্দু চিঠিটা শেষ করতে লাগল।

বুলবুল মুখ ধুয়ে এল, নীলেন্দু চিঠি লিখছে তখনও; নীচে থেকে চা দিয়ে গেল মায়া—নীলেন্দু তখনও লিখছে, চারমিনার সিগারেটের ডাঁই জমে গেছে মাটির ছাইদানে। আরও খানিকটা পরে নীলেন্দুর চিঠি লেখা শেষ হল।

চিঠি শেষ করে নীলেন্দু ছু হাত মাথার ওপর তুলে ক্লান্তি ভাঙল।

বুলবুল বললে, "কাকে চিঠি লিখলে?"

"আমার এক বন্ধুকে। এই চিঠি নিয়ে তুই যাবি।"...

বুলবুল কি যেন জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করল না।

চিঠিটা গুছিয়ে রেখে নীলেন্দু উঠে পড়ল। সারা রাত ঘুম হয় নি, বিছানায় শুয়ে শুয়ে এপাশ ওপাশ করেছে, ভোর রাতে আর থাকতে না পেরে উঠে বসে দেবযানীকে চিঠি লিখছিল। এখন বড় ক্লান্ত লাগছে।

বিছানায় এসে গা ছড়িয়ে খানিকক্ষণ শুয়ে থাকল নীলেন্দু।

"বুলবুল?"

"উ...!"

"তোর বাড়িতে কে কে আছে?"

"বাবা, মা, মেজদি, আর আমার ছোট দুই ভাই।"

"তোর বাবা কোথায় যেন চাকরি করেন!"

"ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ে; মেজদি হাসপাতালে..."

নীলেন্দু বুলবুলের পারিবারিক খবর বেশী জানত না, শুনেছিল একেবারে সাধারণ বাঙালী সংসার। কি করে যে বুলবুল দলে ভিড়ে গিয়েছিল তাও নীলেন্দুর জানা ছিল না। হয়ত বন্ধুদের দেখে শুনে, হয়ত নেহাতই উত্তেজনার বশে, বা এমনও হতে পারে তার কোনো বন্ধু তাকে টেনে নিয়েছিল।

আরও একটু শুয়ে থেকে নীলেন্দু উঠল। বলল, "আমি নীচে যাচ্ছি, সকালেই স্নানটা সেরে আসি, শরীরটা কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছে, তুই বোস।"

পাজামা, গেঞ্জি খুঁজে নিয়ে তোয়ালে কাঁধে চাপিয়ে নীলেন্দু ঘর

ছেড়ে চলে গেল।

বুলবুল কিছুক্ষণ জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল, চুপচাপ। তারপর কি খেয়াল হল, নীলেন্দুর সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে নিল। সিগারেটের নেশা তার নেই, কখনো সখনো একটা আধটা খায়।

সিগারেট খেতে খেতে বুলবুল বিজুর কথা ভাবতে লাগল। এতোক্ষণে নিশ্চয় বিজুর মৃতদেহ মর্গে চলে গিয়েছে, পুরো চব্বিশ ঘণ্টা হয়ে গেল, পুলিস বাড়ি তল্লাসি সেরে ফেলেছে নিশ্চয়, বাড়িতে কোথায় কি পেয়েছে কে জানে—বোধ হয় বুলবুলদের ব্যাপারটা জেনেও ফেলেছে, কে জানে, পুলিশ বুলবুলদের বাড়িতে খোঁজ করতে গিয়েছে কি না! পুলিশকে বিশ্বাস নেই, বাড়িতে গিয়ে হয়ত বলবে, বুলবুলরা তিন বন্ধু মিলে আর এক বন্ধুকে খুন করে পালিয়ে গেছে। এ-রকম কথা শুনলে বাড়িতে যে কি কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে—বুলবুল অনুমান করতে পারছে।

বিজু তাদের সর্বনাশ করে গেল। এখন বুলবুলদের কপালে কি আছে এক ভগবানই জানেন। এমনিতে ধরা পড়লে—মার ধোর জেল হতে পারত, কিন্তু খুনের মামলায় জড়িয়ে দিলে কি হবে কে জানে! আর পুলিশ কি না পারে! তার অসাধ্য কাজ নেই। তবে বিজু যে আত্মহত্যা করেছে—এটা তো পোস্ট মর্টম রিপোর্টেই পাওয়া যাবে। তখন বুলবুলরা খুনের আসামী হবে না। কিন্তু শালা বড় সাংঘাতিক জিনিস, আত্মহত্যাকে খুনের মামলায় চালিয়ে দেবে না এটা কে বলল? নীলুদা অবশ্য বলছে, তা পারবে না, তবে হয়রান করতে পারে।

বিজু ছাদে বেরিয়ে এল। আকাশ গাঢ় মেঘলা। বৃষ্টি আসতেও পারে, বোঝা যাচ্ছে না।

আরও খানিকটা বেলায় নীলেন্দু কোথায় বেরিয়ে গেল।

বুলবুলকে বলল, "আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসব।"

বুলবুল ঘরেই থাকল।

ঘণ্টাখানেক পরে ফিরল নীলেন্দু। হাতে একটা প্যাকেট। বুলবুলের হাতে দিয়ে বলল, "ওই প্যাকেটের মধ্যে তোর জন্যে একটা প্যাণ্ট আর জামা এনেছি, একটা পাজামা রয়েছে, সব আন্দাজে কিনেছি। দেখে নে।"

বুলবুল প্যাকেটটা খুলল। প্যাণ্ট, জামা, পাজামা শুধু নয়, দুটো গেঞ্জি, একটা খদ্দরের পাঞ্জাবিও রয়েছে।

বুলবুল কেমন সঙ্কুচিত হয়ে বলল, "এত জিনিস তুমি কিনে আনলে ?"

"তোর তো কিছু নেই। সস্তায় কিনেছি। যেখানে যাবি সেখানে কিছু পাবি না। তাছাড়া একটু সাজ পালটে যা গাধা, রেলে যাবি।"

বুলবুল মুখ ঘুরিয়ে নিল, তার ভীষণ কান্না আসছিল।

নীলেন্দু কি মনে করে বলল, "আমার একটা ব্যাংক আছে, বুঝলি। ছোটকাকা আমার ব্যাংক। চাইলে বিশ-পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দেয়। এবার একটু বেশী নিয়েছি। তোর গাড়িভাড়াও রয়েছে।..."

বুলবুল বাঁ হাতে চোখ মুছল।

নীলেন্দু দেখতে পেয়েছিল, হেসে বলল, "শোন বুলবুল, তোকে একটা কথা বলি। আমার ছোটকাকা উকিল মানুষ, মক্কেলদের পয়সায় রিচ্ ম্যান। এই একশো দেড়শো টাকায় তার যায় আসে না।...কাকা আমায় ভীষণ ভালবাসে।...তুই ওসব ভাবিস না।"

বুলবুল মুখ ফেরাল না।

দুপুরের দিকে বৃষ্টি নামল। নীলেন্দু ঘুমোচ্ছিল। বুলবুল বসে বসে একটা গল্পের বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিল। বৃষ্টি নেমেছে দেখে বুলবুলের ভয় হল, এই বৃষ্টি যদি এইভাবে চলে তা হলে সে কেমন করে হাওড়ায় পৌঁছবে ? কলকাতায় বৃষ্টি এখন যেভাবে নেমেছে

এভাবেই ঘণ্টাখানেক চললে রাস্তায় যে জল দাঁড়াবে তাতে সন্দেহ নেই।

নীলেন্দুর মাথার দিকে জলের ঝাপটা আসতেই তার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলে তাকাতেই দেখল, টেবিলের কাছে বুলবুল বসে আছে, বসে বসে ওপাশের জানলা দিয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টি দেখছে।

নীলেন্দু মাথার দিকে জানলা বন্ধ করল।

শব্দ শুনে তাকাল বুলবুল। নীলুদা উঠে বসে জানলা বন্ধ করছে।

বুলবুল বলল, "বেশ বৃষ্টি হচ্ছে···।"

নীলেন্দু বলল, "তুই ঠায় বসে আছিস? একটু ঘুমিয়ে নিলে পারতিস। রাত্তিরে ট্রেনে শুতে পারবি না; ভিড় হয় খুব।" বলতে বলতে হাই তুলল।

আর শুলো না নীলেন্দু। বসে থাকল। ইশারায় বুলবুলকে টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই দিতে বলল।

বুলবুল সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই এনে দিয়ে বলল, "ট্রেন কটায়?"

"সাড়ে-আটটা নাগাদ গেলেই চলবে।"

অপেক্ষা করে বুলবুল বলল, "তুমি কার কাছে আমায় পাঠাচ্ছ নীলুদা?"

নীলেন্দু সিগারেটের ধোঁয়া গিলে চুপচাপ তাকিয়ে থাকল। মুখ দেখছিল বুলবুলের।

"তুই চিনবি না," নীলেন্দু সামান্য পরে বলল।

বুলবুল সন্তুষ্ট হল না। তার কৌতূহল যে সারা দিনে কত তীব্র হয়েছে নীলেন্দুর পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। কোথায় যাচ্ছে বুলবুল, কার কাছে যাচ্ছে—এটুকু অন্তত তার জানা উচিত।

বুলবুলের চোখ দেখতে দেখতে নীলেন্দু বলল, "তোর ভয় করছে?"

মাথা নাড়ল বুলবুল, "না···। তুমি যখন পাঠাচ্ছ জেনেশুনেই পাঠাচ্ছ।. তবু কোথায় যাচ্ছি জানতে ইচ্ছে করছে।"

কি মনে করে নীলেন্দু বলল, "বোস।"

বুলবুল নীলেন্দুর পাশে বসল।

নীলেন্দু কিছুক্ষণ কোনো কথা বলল না। সিগারেট খেতে লাগল। শেষে বলল, "তোকে যার কাছে পাঠাচ্ছি সে আমার বন্ধু বা বান্ধবী যা মনে হয় বলতে পারিস। তার স্বামীও আমার বন্ধু। আমি তাকে দাদা বলি। একসময়ে আমাদের সঙ্গে খুব মেলামেশা ছিল। এই কলকাতাতেই থাকত। তারপর হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে দু-জনেই বাইরে চলে গেল। বাইরে গিয়ে চাষফাস করছে, তাঁত কলটল চালাবার চেষ্টায় রয়েছে।···লোক ভাল, তোর ভয়ের কোনো কারণ নেই।···তবু একটা কথা তোকে বলে দি। যদি দেখিস তারা তোকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে আমায় লিখবি, কোনো গণ্ডগোল করবি না, আমি অন্য ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব।"

বুলবুল জিজ্ঞেস করল, "চাষফাস করার চেষ্টা করছে কেন?"

"ওরাই জানে।···তুই ওখানে গেলেই জানতে পারবি সব।···গিয়ে দেখ না—কি বলে ওরা···" নীলেন্দু হালকা ভাবে হাসল, "কত রকমের মানুষ থাকে রে জগতে, এক-একজনের এক-এক খেয়াল। তোর ভালও লেগে যেতে পারে।"

বুলবুল সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে গেল, তারপর বলল, "জানো নীলুদা, আমাদের দেশ নান্নুরে, আমার দাদামশাই ক্ষেতটেত নিয়ে থাকত আর হোমিওপ্যাথি করত। ছেলেবেলায় আমি অনেকবার নান্নুরে গিয়েছি, ধানের গোলা দেখেছি···"

নীলেন্দু জোরে হেসে উঠল।

বুলবুল অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে গেল।

নীলেন্দু হাসতে হাসতে বলল, "কলকাতার ছেলে দেশের বাড়িতে গিয়ে ধানের গোলা দেখেছিস—এই তো যথেষ্ট রে। কত ছেলে ধান

গাছ না দেখেই গ্রামে বিপ্লব করতে গেল। গিয়ে সাপের ভয়ে ভূতের ভয়ে পালিয়ে এল !···দূর—আমাদের দিয়ে কিছু হবে না।"

বুলবুল ব্যাপারটা ভাল বুঝল না।

চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে বুলবুল আচমকা বলল, "নীলুদা, এরপর কি হবে ?"

"কিসের ?"

"আমাদের কথা বলছি···।"

"তোদের মানে তোর, মান্টুটানুর ?"

"হ্যাঁ, আমাদের সকলের।"

নীলেন্দু নীরব।

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নীলেন্দু বলল, "আমি জানি না।"

## এগারো

তখনও বৃষ্টি পড়ছিল। পাতলা বৃষ্টি। ভেজা চেহারা নিয়ে বুলবুল মহীতোষদের বাড়িতে এসে উঠল।

বাড়িতেই ছিল মহীতোষ. লাটু দেখতে পেয়েছিল বুলবুলকে, ডেকে দিল।

মহীতোষ কিছু বলার আগেই বুলবল তার পরিচয় দিল, বলল, আমি নীলুদার কাছ থেকে আসছি। একটা চিঠি দিয়েছেন তিনি।

নীলেন্দুর সেই কিট্ ব্যাগ, বৃষ্টির জলে ভিজে যাবার ভয়ে বুলবুল চিঠিটা কিট্ ব্যাগের মধ্যে রেখেছিল, ব্যাগ খুলে চিঠিটা বের করে দিল।

মহীতোষ চিঠিটা নিল। খামে মোড়া চিঠি। ওপরে লেখা 'দেবীদি।'

মহীতোষ দেবযানীকে ডাকল।

দেবযানীর আসতে দেরি হচ্ছে দেখে মহীতোষ বুলবুলকে বলল, "তুমি ভেতরে চলো, জামাটামা ছেড়ে ফেল। এখানে আজ গোটা হপ্তাটাই খুব বৃষ্টি হচ্ছে।"

ঘরে ঢোকার মুখেই দেবযানীর সঙ্গে দেখা। মহীতোষ চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "নীলুর চিঠি। এই ছেলেটি কলকাতা থেকে আসছে।"

দেবযানী চিঠি নিল। বুলবুলকে দেখল ভাল করে। রোগা চেহারা, বয়েস বড় কম, মাথাভর্তি ভেজা চুল, মুখ যেন মাছের আঁশের মতন ফ্যাকাশে।

মহীতোষ বলল, "ও আগে জামাটামা ছেড়ে নিক, সকালবেলায় এমন ভিজলো ..."

দেবযানী বুলবুলকে জিজ্ঞেস করল, "নীলু কেমন আছে?"

"ভাল।"

"ওর বাড়ির খবর জান?"

"ভাল—" বুলবুল বড় আড়ষ্ট বোধ করছিল।

মহীতোষ বলল, "ওসব পরে হবে, আগে ভেজা জামা প্যান্ট ছেড়ে নাও।"

দেবযানী আর দাঁড়াল না, চলে গেল।

গায়ের জামাটা খুলতে খুলতে বুলবুল বলল, "বাথরুমে গিয়ে সব ছেড়ে আসি? ঘরের মধ্যে জল পড়ছে।"

"এসো— ; এদিকে বাথরুম।"

বুলবুল কিট ব্যাগ খুলে শুকনো জামাটামা বের করে নিতে লাগল।

রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে দেবযানী নিজের ঘরে বসে নীলেন্দুর চিঠি পড়তে লাগল ঃ

দেবীদি,

সবার আগে তোমার—তোমাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আমার

একটি অন্যায় কাজের কথা জানাচ্ছি। যে-ছেলেটির হাত দিয়ে এই চিঠি পাঠাচ্ছি সে আমার চেনা। বুলবুল খুবই ছেলেমানুষ, তার না আছে শারীরিক সামর্থ্য না মানসিক ক্ষমতা, সে তোমাদের কোনো ক্ষতির কারণ হবে না। তার কাছ থেকেই ওর সব কথা শুনতে পাবে। মিথ্যে কথা বলবে না ও, কেননা বলে কোনো লাভ নেই। ছেলেটি বড় বিপন্ন। তুমি তাকে আশ্রয় দেবে এই বিশ্বাসে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। মহীদাকেও আমি যতটা চিনি, আমার বিশ্বাস, সেও বুলবুলকে কিছু-দিনের জন্যে রেখে নিতে অরাজী হবে না।

এবার অন্য কথায় আসি। তোমার চিঠি পেয়েছি। প্রথমে ভেবেছিলাম অবজ্ঞা করব। শেষে পারি নি। পরিতোষের কাছে গিয়েছিলাম। কথা বলেছি। সে যথেষ্ট বুদ্ধিমান, সাংসারিক জ্ঞান-গম্যি তার রয়েছে। মহীদাদের পুরোনো বাড়ির দিকটা বস্তি-ফস্তি উঠে, কিছু বাড়ি ভেঙেচুরে নতুন রাস্তাঘাট আরও যেন কি কি হতে যাচ্ছে। ফলে ওই বাড়ির পজিশন ভাল হয়ে যাচ্ছে, জমির দামও যাচ্ছে বেড়ে। এখন ওই বাড়ি বেচলে যা আসবে, দু-তিন বছর অপেক্ষা করে বেচলে তার ডবল আসতে পারে। পরিতোষ তাই গড়ি-মসি করছিল। তা ছাড়া সে বলছিল যে, তার দাদার এই খেয়াল মিটে যাবার পর তোমরা শূন্যহস্ত হয়ে পড়বে—তখন তোমাদের কি থাকবে? তোমার শ্বশুরবাড়ির দু-একটা ঘরে মাথা গোঁজার জায়গা ছাড়া আর কিছু থাকবে না, ভবিষ্যৎ ফাঁকা। এসব হল সংসারী পরি-তোষের কথা। সে মহীদাকে চিঠি দেবে। আপাতত সামান্য কিছু টাকাও পাঠাতে পারে। ···এই ব্যাপারে আমার আর কিছু করার নেই।

দেবীদি, খুব জরুরী কথাগুলো শেষ করে এখন তোমায় অজরুরী কিছু কথা বলি। আমার বাবা অসুস্থ; তোমাদের ওখান থেকে ফিরে এসেই এক-একটি পারিবারিক ঝঞ্ঝাট নিয়ে ছিলাম। শুভেন্দু অ্যাক-সিডেন্ট করে হাসপাতালে ছিল, তারপর হল বাবার হার্ট অ্যাটাক।

বাবার এখন যাবার পালা। মেজকাকা বড় সরল ভালমানুষ, ব্যবসা চালাবার ক্ষমতা তাঁর নেই, ছোটকাকা নিজের ওকালতির বাইরে মাথা খেলাতে চায় না, পারেও না। শুভেন্দু নিজের কাজকর্ম নিয়ে ছোটাছুটি করছে। আমাদের সংসারে যে একটা দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে এটা আমি বুঝতে পারছি। অনেক যত্ন করে, স্বার্থকে ঘাড়ে চাপতে না দিয়ে, ভাইদের দু পাশে রেখে বাবা যে সংসার গড়ে তুলেছিলেন তার ভাঙা, ছন্নছাড়া টুকরো টুকরো চেহারা বাবা দেখতে চান না। কাকারাও নয়। কিন্তু একে সামলে রাখার যোগ্যতা আমাদের নেই। কাজেই কি যে হবে আমি বুঝতে পারছি না। এই থেকেই আমার মনে হচ্ছে, একজন যা চায়, যা তার সাধ্য—অনেকের তেমন ইচ্ছে থাকলেও তাদের সাধ্যে তা কুলোয় না।

তোমায় কটা কথা লিখি। আমার বয়েস এমন কিছু কম নয়, তোমার কান ধরলেও সেটা ক্ষমা করা যেতে পারে। তবে মেয়েরা শুনি একটা বয়েসের দাগ পেরুলে জোয়ারের জলের মতন বাড়ে, তাদের মাথার ঘিলু দেখতে দেখতে ক্ষীর হয়ে ওঠে; সেদিক থেকে তুমি হয়ত আমার মাথার চুলের ঝুঁটি টেনে বলতে পার—আমি জ্ঞানহীন। সে অধিকার আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। স্বীকার করে নিয়েও পরের কথাগুলো লিখছি।

দেবীদি, যখন নিজেকে নিয়ে ভাবি, আজকাল থেকে থেকেই এই ভাবনা হয়, তখন কেমন যেন মনমরা হয়ে যাই। আমার জীবনের বারো আনাই তোমার জানা। নতুন করে বলার মানে হয় না। তবু বলি, যে চার আনা তুমি জানো না, তার কথাও তোমায় আজ বলতে ইচ্ছে করে।...সংসারে এক-আধজন থেকে যায় যার কাছে নিজের সমস্ত কিছু কোনো-না-কোনো সময়ে বলতে ইচ্ছে করে। মহীদা আমার কাছের মানুষ, কিন্তু তোমার চেয়ে কাছের নয়, তুমি আমার সুখদুঃখের মধ্যে জড়িয়ে আছ।

তোমায় বলতে আমার বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই যে, আজকাল মাঝে

কাদার গুঁড়ো না হয় গঙ্গার জল চলে—সেদেশে আমরা শুধু সহ্যই করব, এ কেমন করে হয় দেবীদি ?

এই অসহ্যতাই আমাদের পাগল করে তুলেছিল। আমরা কোনো কিছুই আর বিশ্বাস করতে চাই নি, কোনো কিছুর ওপর আস্থা রাখতে রাজী হই নি। যা-কিছু পুরোনো—এতোকাল যা মাথায় বসে আমাদের চুল মুঠো করে ধরে ডানে বাঁয়ে ঘুরিয়েছে—আমরা তাকে মাথা থেকে ফেলে দেবার চেষ্টা করেছি। ব্যক্তিগত কথা এটা নয় দেবীদি, সেভাবে তুমি দেখো না। আমার বাবা, আমার কাকা ঘরে ঘরে নেই। মহীদার বাবা কি ছিল তুমি জান। তোমার দাদারা কেমন ধরনের মানুষ তুমি জান। সোজা কথাটা এই, এমন একটা অবস্থার জন্যে কে দায়ী ? আমরা কি ? যারা কয়েক পুরুষ ধরে আমাদের এই পথে টেনে এনেছে তারা দায়ী। জন্মের কোনো দায়িত্ব থাকে না, জীবনের থাকে। জীবনকে যারা লালন করে তাদের থাকে। সে দায়িত্ব আমাদের জন্যে কেউ পালন করে নি। তার ভোগ ভুগতে হবে বইকি !

এত কথা লিখেও আমার শান্তি হচ্ছে না। ভাই দেবীদি, তুমি আমার একটা কথা বিশ্বাস কোরো। আমি বিদ্রোহ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু রক্তপাত করতে নয়। মহীদা একটা জিনিস ভুল করেছে। আমরা সবাই উন্মাদ হবার দিকে পা বাড়াই নি। অনেক ছেলে ছিল যারা সত্যি সত্যিই চেয়েছিল—এই পুরোনো, জগদ্দল কাঠামো ভেঙে দিতে। তারা আশা করেছিল কলের পুতুল ভেঙে এমন কিছু এনে বসাবে যা জীবনকে মূল্য দেবে। মহীদা এ-কথাটা বোঝে নি।

এবার চিঠি শেষ করি। তোমাদের ওপর আর আমার কোনো ঘৃণা নেই, রাগ নেই। কেন নেই জান ? বাস্তবিক পক্ষে আমি যা তোমরাও তাই, দু তরফই নিষ্ক্রিয়, অক্ষম। আমি বরাবর আড়ালে আড়ালে থেকে গিয়েছি, যারা আড়ালে থাকে তারা কোনো ভূমিকা

লন করে না। মহীদাও সেই আড়ালের মানুষ। আমিও। আমর. কোনো কিছুই করতে পারি নি। আর আজ মনে হয়, পারার দিন শেষ হয়ে গেল।

বুলবুলকে পাঠিয়ে মনে হচ্ছে, সে হয়ত একটা সান্ত্বনা পেতেও পারে। অবশ্য যদি মহীদা তার নতুন কাজকর্ম থেকে আবার না পালিয়ে যায়। আমি চাই, মহীদা যা করতে চেয়েছে তা যেন করতে পারে। তোমায় একদিন বলেছিলুম, সে হয়ত আবার পালাবে। আজ বলছি তুমি তাকে পালাতে দিও না। তাকে বলো, যে কাজ সে করতে নেমেছে—যার জন্যে তুমি সবই দিয়েছ, তার পাশে দাঁড়িয়ে আছ—সে-কাজ তাকে করতেই হবে। বার বার ছল করে পালিয়ে গিয়ে সে বাঁচবে না। তুমি আমার প্রণাম নিও। প্রণামে ক্ষতি কি!

ইতি

তোমার নীলু

মহীতোষ ঘরে এসে দেখল, দেবযানী চিঠি পড়ছে। চোখের জমি পরিষ্কার নয়। ঝাপসা। চিঠি শেষ করে দেবযানী মহীতোষের দিকে তাকাল।

কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না।

শেষে মহীতোষ বলল, "ছেলেটির জামাটামা ছাড়া হয়ে গেছে।"

দেবযানী উঠল। নীলেন্দুর চিঠিটা এগিয়ে দিল।

মহীতোষ চিঠি নিয়ে বলল, "তোমায় লিখেছে।"

চলে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে দেবযানী বলল, "তোমাকেও।"

দেবযানী ঘর থেকে চলে গেল।

মহীতোষ চিঠিটা দেখল। বুলবুল কেন এসেছে মহীতোষ জানে। তার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু নীলু এত বড় চিঠি কেন লিখল সে বুঝতে পারছে না।